আনন্দমেলা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস

ভুতুড়ে দুপুর

২৪ আগস্ট ১৯৮৩
২·৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন

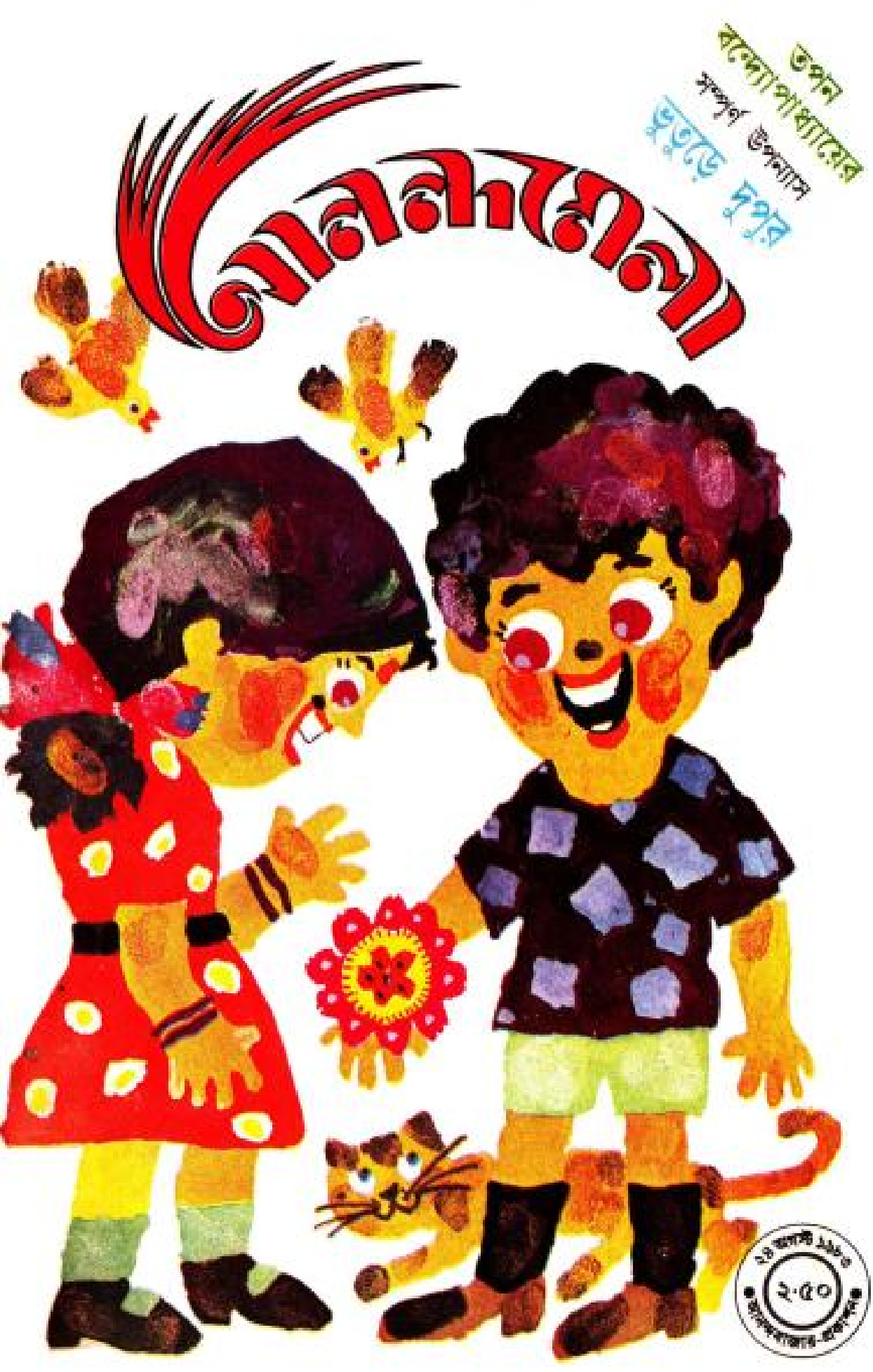

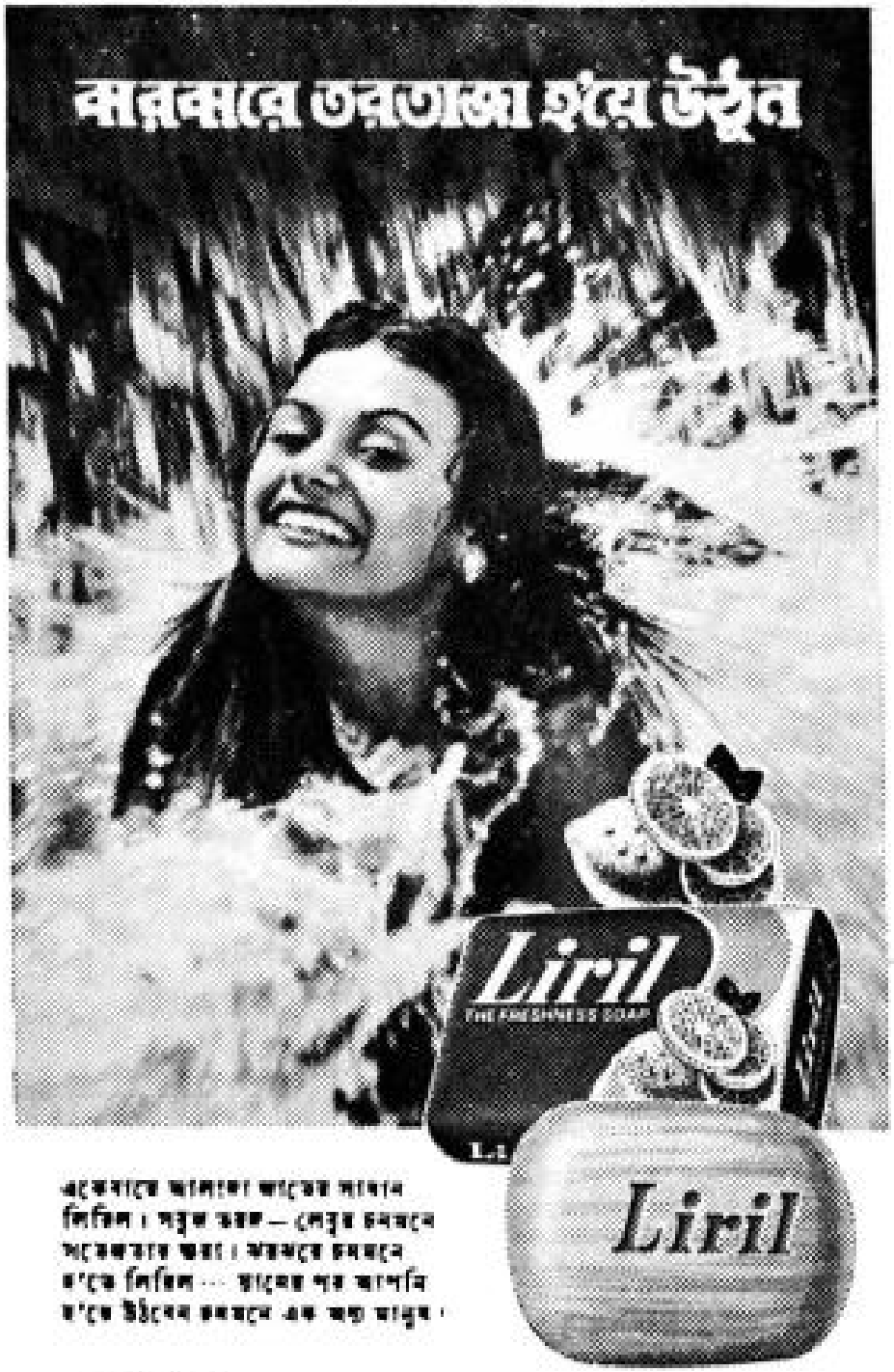

ঝরঝরে তরতাজা হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান
লিরিল। সবুজ রঙ— লেবুর চনমনে
সতেজতার ছটা। ঝরঝরে চনমনে
হ'চ্ছে লিরিল… স্নানের পর আপনি
হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ।
লিরিল
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
লিন্টাস - LR.27.1610
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ভুতুড়ে দুপুর ৪৮
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতিকথা

ব্যাট-বলে ১৯
পঙ্কজ রায়

বিশেষ রচনা

গাঁদা ৬
ভিক্ষু বুদ্ধদেব

কাজের খোঁজে ৪৪
মানস রায়

ধারাবাহিক উপন্যাস

কুয়াশা ২৯
বুদ্ধদেব গুহ

গল্প

বিশে ডিসেম্বরের রাত্রি ১০
চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ

লোভের সাজা ২৬
সন্ধ্যা দত্ত

কে বড় ৪০
আরতি দাস

কুলির বেড়াল ৭১
বাণীব্রত চক্রবর্তী

কিশোর-ক্লাসিক

রবিনসন ক্রুসো ৭৬
ভাষান্তর : শেখর বসু

ছড়া

জানো কি তা ৮৩
সমর মিত্র

ভাগাগণনা ৮৩
সুখেন্দু মজুমদার

খেলাধুলো

এই শীতে ৮৫
মণি শর্মা

খেলার নামে নোংরামি ৮৯
মণীশ মৌলিক

বিজ্ঞানবিচিত্রা, ধাঁধা-মজা, শব্দসন্ধান, কমিকস, তোমাদের পাতা, লেখাপড়া ও অন্যান্য আকর্ষণ প্রচ্ছদ : দেবাশিস দেব

কাল ছিল রাখি-পূর্ণিমা ভাই,
যাকে রাখি, সে-ই রাখে,
সকলকে রাখি পরিয়েছি তাই,
বাদ দেব বলো কাকে।
এতদিন আড়ি দিয়েছ, এবার
মিলনের সুর সাধো,
সকলকে কাছে ডেকে নাও, আর
রাখি-বন্ধনে বাঁধো।

৭ ভাদ্র ১৩৯০ ২৪ অগস্ট ১৯৮৩ ৯ বর্ষ ১০ সংখ্যা

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে [illegible] রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়
সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ
শৈলেন ঘোষ

বড়গল্প

আশাপূর্ণা দেবী
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সুবিশাল

চিত্রকাহিনী

অদৃশ্য প্রহরী

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের আরও একগুচ্ছ চিঠি।

অবনীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনির্মল বসুর ছড়া।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-লেখিকার গল্পগুচ্ছ।

পরীক্ষার্থীদের জন্য

হেড একজামিনারদের লেখা:
কী করে নম্বর বাড়াতে হয়

দাম ২০·০০ টাকা
রেজিস্ট্রী ডাকে ২৩৮০ টাকা

ফটো টাইপ সেটিং-এ এবং অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা, অনবদ্য লেখায় ঠাসা পূজাবার্ষিকী

ABP/AM/CAS-1/83 BEN

বিজ্ঞানবিচিত্রা

ভাগ্যিস ছায়াপথে মেঘ !

চরকিবাজি পোড়ালে যেমন আগুনের কুণ্ডলী দেখা যায়, আমাদের ছায়াপথের চেহারাটা অনেকটা সেই রকম। সৌরজগৎ রয়েছে ঐ কুণ্ডলীর বাইরের দিকে একটি ধারে। কেন্দ্রস্থলে ঠিক কী আছে বলা শক্ত তবে ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ই বেইলি সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, প্রায় দশ কোটি বছর অন্তর কেন্দ্রস্থল থেকে মহাজাগতিক রশ্মির প্লাবন সমস্ত ছায়াপথকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই বিকিরণ-বন্যায় কোনও প্রাণীরই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলে তো পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পর থেকে অন্তত তিরিশবার এই প্লাবন দেখা দিয়েছে, অথচ পৃথিবীতে তো বারবার প্রাণীরা লুপ্ত হয়ে যায়নি ! এর জবাবে কানাডার টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডেভিড ডানলপ' মানমন্দির জানিয়েছে যে, মহাজাগতিক তড়িৎকণা দিয়ে তৈরি একটি বিরাট মেঘ সৌরজগৎকে ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে আড়াল করে রেখেছে। তাই, বিকিরণ-বন্যার সময় ঐ মেঘ মহাজাগতিক রশ্মির কিছুটা শুষে নেয়, কিছুটা প্রতিফলিত করে দেয় ; ফলে পৃথিবীতে প্রাণীরা আক্রান্ত হয় না।

শাপে বর

আমেরিকার শিকাগো শহরের আকাশ প্রায়ই মেঘলা থাকে। তাছাড়া, ওখানকার আবহাওয়া বেশ স্যাঁতসেঁতে এবং প্রায়ই ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়। ফলে, শিকাগোর আশেপাশে চাষের জমিতে বেশ ভাল ফলন হয়। সম্প্রতি 'ইলিনয়েস্ ওয়াটার সারভে ডিভিশন'-এর বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, এর জন্য দায়ী নাকি বিমান। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিমান ওঠা-নামা করে শিকাগোর ও'হেয়ার বিমানবন্দরে। তাই

বিমানের জ্বালানির ধোঁয়ায় ও বাষ্পে ওখানকার আবহাওয়া খুবই দূষিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তার ফলে শিকাগোর শাপে বর হয়েছে। কারণ, জ্বালানির রাসায়নিক ধূলিকণা মাটির তাপ বিকিরণ রোধ করে, জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করে এবং জলকণাকে আকাশের বেশি উঁচুতে উঠতে দেয় না। তাই শিকাগোর বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা যথেষ্ট বেশি থাকে।

বেবুনের ঘিলু খেতে ভাল !

লক্ষ-লক্ষ বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানুষ বন্যপ্রাণী শিকার করে খেত ; কিন্তু এই খাদ্যতালিকায় বাঁদর গোষ্ঠীর নাম কখনও শোনা যায়নি। সম্প্রতি কেনিয়ার ওলোরগেসেলাই নামক জায়গায় খুঁড়তে-খুঁড়তে জনস হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাট শিপ্‌ম্যান পেয়েছেন ৯০টি বেবুনের কঙ্কালের ফসিল। ফসিলগুলো চার লক্ষ থেকে সাত লক্ষ বছর আগেকার। বেবুনগুলোকে যে বধ করা হয়েছে তার প্রমাণ ওদের প্রত্যেকের খুলির মাঝখানে গর্ত করা আর চারপাশে ছড়ানো নানারকম পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র। শিপ্‌ম্যানের ধারণা, ওখানকার আদিম মানুষ হয়তো বেবুনের মাথার ঘিলুর স্বাদ পেয়েছিল, তাই তারা সুযোগ পেলেই বেবুনের মাথা ফাটাত।

চঞ্চল পাল

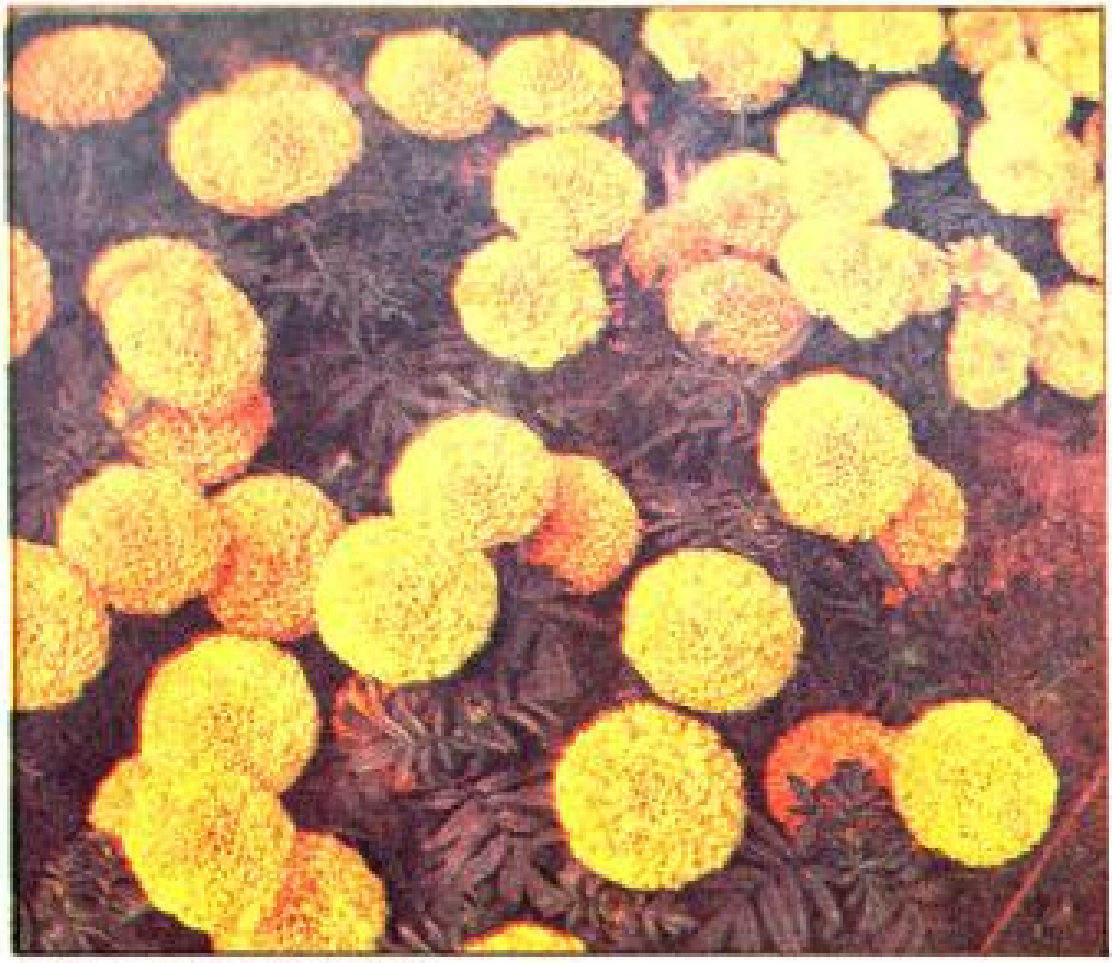

টবের চারায় ফুটেছে আফ্রিকান গাঁদা

গাঁদা

ভিক্ষু বুদ্ধদেব

সাদা গাঁদা দেখেছ ? আমার ভাগ্য ভাল এই প্রশ্ন আমি কুড়ি বছর আগে করিনি। নইলে নির্ঘাত শুনতে হত, 'সাদা গাঁদা ? পাগল না মাথা-খারাপ ?' এই বছর-কুড়ির ভেতরে ফুলের জগতে নতুন এসেছে ভাবল বুগেনভিলিয়া, সবুজ চন্দ্রমল্লিকা, সবুজ জিনিয়া, সুগন্ধি চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি যা একসময়ে সবাই অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছিল। সাদা গাঁদা তৈরি হয়েছে আমেরিকার বারপি কোম্পানির প্রচেষ্টায়। সাদা গাঁদা হওয়া সম্ভব, এই ধারণা অনুযায়ী প্রতি বছরই এঁরা কিছু বীজ তৈরি করতেন। এঁদের এই বীজ থেকে প্রথমে সত্যিকারের সাদা গাঁদা যিনি দেখাবেন তাঁকে ভাল পুরস্কার দেওয়া হবে, এই ঘোষণা বলবৎ ছিল। এটা কবে শুরু হয়েছিল তা আমার জানা নেই, তবে তা অন্তত পঁচিশ বছর আগে হয়ে থাকবে। ভারতসহ বহু দেশের পুষ্পপ্রেমীরা এই বীজ থেকে সাদা গাঁদা পাবার চেষ্টা করেছেন। এক আমেরিকান মহিলার পাওয়া ফুল সত্যিকারের সাদা গাঁদা বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তিনি ১৯৭৮-এ এই পুরস্কার লাভ করেছেন। পুরস্কারের অর্থ কত হতে পারে বলো তো ? দশ হাজার ডলার অর্থাৎ আমাদের টাকার অঙ্কে আশি হাজার টাকা !

সাদা গাঁদা হিসাবে বারপি প্রথম যে বীজ বিক্রি করে তাদের রঙ সাদা হলেও ফুল হিসাবে দেখতে কিছু আহামরি ছিল না। আমার তো ধারণা ছিল যে এ ফুল চলবে না। কিন্তু 'মোবাউ' নতুন যে বীজ এসেছে তাদের ফুল সাদা এবং ফুলও ভাল। সঙ্গে ভাল সাদা গাঁদার ছবি দিচ্ছি, ছাপার কারণে রঙের হেরফের হলে আমায় কিন্তু দোষ দিও না।

শুধু সাদা গাঁদাই নয়, গাঁদার ভেতরে আরও অনেক ধরনের নতুন প্রজাতি পাওয়া যাবে। গাঁদার দুটি প্রধান টাইপ—আফ্রিকান ও ফ্রেঞ্চ, দুটিরই জন্মভূমি মেক্সিকো। আফ্রিকান গাঁদার ভেতরে বড়ফুলের অনেক প্রজাতি পাওয়া যায়। ফ্রেঞ্চ গাঁদা এখানে রক্তগাঁদা নামে পরিচিত, এরও প্রজাতির সংখ্যা প্রচুর। আরও ভাল ভাল প্রজাতি তৈরি করার চেষ্টা পুষ্পবিজ্ঞানীরা করেই যাচ্ছেন। ঐরা গাঁদার প্রধান দুটি টাইপকে মিশিয়ে একটি নতুন টাইপ সৃষ্টি করেছেন যার নাম আফ্রো-ফ্রেঞ্চ, এর ফুল অনেকটা আফ্রিকানের মতো কিন্তু গাছের প্রকৃতি ফ্রেঞ্চের মতো। এই নতুন টাইপ গাঁদার এবং খুব উন্নত ধরনের বীজের গাঁদা অনেক জায়গায় প্রতি বছর বীজ কিনে করতে হয়। গাঁদার এই ধরনের বীজের কী রকম দাম আন্দাজ করতে পার? কুড়িটি বীজের দাম পনেরো টাকা! তাই বুঝতেই পারছ ফি-বছর এই বীজ কিনতে হলে কত খরচ। সমতল বাংলায় কিন্তু মস্ত একটা সুবিধা রয়েছে—বীজ থেকে করা গাছ আমরা বছরের পর বছর ডালিয়া বা চন্দ্রমল্লিকার মতো বাঁচিয়ে রাখতে পারি। এতে প্রচুর সংখ্যায় গাছ পেতে পারি এবং সেগুলি তৈরির খরচও নামমাত্র।

গাঁদার কোন্ প্রজাতির ফুল সবচেয়ে বড়? আফ্রিকান জায়ান্ট সবচেয়ে বড় ফুলের গাঁদা, এদের ফুলের ব্যাস দশ সেমি বা আরও বেশি। হলদে ও কমলা —এই

সাদা আফ্রিকান গাঁদা

টবের চারায় রক্ত-গাঁদা

তাড়াতাড়ি করুন! ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড পট্টি লাগান আপনার বাচ্চাকে সুরক্ষিত রাখার শ্রেষ্ঠ উপায়

ওর এই অনাবৃত ক্ষতে একটুও ধুলোবালি লাগলেও তা দূষিত হয়ে উঠতে পারে

সারা বিশ্বে মায়েরা অনাবৃত ক্ষতকে সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য **ব্যাণ্ড-এইড** পট্টির ওপর নির্ভর করেন।

ব্যাণ্ড-এইড পট্টিতে আছে একটি প্রমাণিত এনটিসেপটিক যা ক্ষতের উপশমে সাহায্য করে। এর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হাওয়া চলাচল করে ব'লে ক্ষতকে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে সারিয়ে তোলে। তাছাড়া এতে আছে বেশী আরামদায়ক অনন্য একটি প্যাড যা চটচট করে না।

ব্যাণ্ড-এইড পট্টি নানা আকারে ও সাইজে পাওয়া যায়। খুচরো ক্ষত, কাটা-ছ'ড়ে যাওয়া, যেখানে সাধারণত পট্টি লাগানোর অসুবিধে, ফোড়া ও [illegible] — সব ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। হাতের কাছে **ব্যাণ্ড-এইড** পট্টি রাখুন। সবসময়ে।

ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড পট্টি

সংক্রমণের হাত থেকে নির্ভরযোগ্যভাবে সুরক্ষিত রাখে

Johnson & Johnson

OBM/9283/BN

দুটি আলাদা রঙে এদের পাওয়া যায়। আফ্রিকান জায়ান্টের বীজ কলকাতার সাটন বা অন্য জায়গায় সহজেই পাবে। সব গাঁদার মতোই এর চাষও সহজ। তবে আফ্রিকান জায়ান্টের বীজের বেশ একটা বড় অংশ সিঙ্গল ফুল দেয়, এবং ফুল না-ফোটা পর্যন্ত এটা বোঝাও যায় না। ডাবল ফুলের ভেতরে কিছু সিঙ্গল ফুল ফুটে থাকলে দেখতে বড় খারাপ লাগে, কিন্তু এ সময়ে কিছু করারও থাকে না। একটি নতুন পদ্ধতিতে এদের সব গাছেই কিন্তু ডাবল ফুল পাওয়া যায়। বড় ফুলের আফ্রিকান গাঁদা ও ফ্রেঞ্চ গাঁদা ভাল ফোটে শীতের মরসুমে, ছোট ফুলের আফ্রিকান কিছু প্রজাতিকে চাষ করা যায় বছরের যেকোনো সময়ে। শীতের মরসুমের গাঁদার জন্য বীজ বোনার প্রধান সময় সেপ্টেম্বর থেকে নবেম্বর। আফ্রিকান জায়ান্ট শীতের মরসুমের ফুল হলেও এর বীজ বুনব অগস্ট মাসে, চেষ্টা করব অগস্টের যত তাড়াতাড়ি বুনতে পারি। চারাগাছ তুলে লাগাব জমিতে বা বড় টবে। এই গাছের বেলায় সবচেয়ে বড় ডালটিকে বাড়তে দেব, কিন্তু পাশের ডাল সেমিসাতেক বড় হলেই সে ডালের মাথা খুঁটে দেব—মাথা খুঁটে দেবার কারণে বেরুনো নতুন ডালেরও মাথা খুঁটে দেব একই ভাবে, এবং এটা চলবে এভাবেই। গাছের সবচেয়ে বড় ডালটিতে চারাগাছ লাগাবার মাস-দুয়েকের ভেতরে ফুল আসবে। এই ফুলটি কিছুটা ফুটলেই বোঝা যাবে যে সেটি পুরো ডাবল হবে, না কি সিঙ্গল। যে গাছগুলিতে সিঙ্গল ফুল হচ্ছে তাদের গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেওয়া হবে। যেগুলি ভাল ডাবল ফুল দিচ্ছে তাদের ফুল-দিয়েছে ডালটিকে কেটে ফেলা হবে। ছোট ডালগুলিকে খুঁটে দেবার কারণে এক-একটি গাছে অনেক কচি ডাল থাকবে। এই কচি ডালগুলিকে ডালিয়া বা চন্দ্রমল্লিকার মতো কাটিং করে বহু নতুন গাছ তৈরি করে নেব। এই গাছগুলি শীতের মরসুমে সবাই পুরো ডাবল ফুল দেবে।

জমি বা টব—দুয়েতেই গাঁদার চাষ অত্যন্ত সহজ। আফ্রিকান গাঁদা খাবার বেশি চায়, এদের চাষে এই সারমাটি ব্যবহার করতে পার : দুই ভাগ বাগানের মাটিতে একভাগ গোবরসার মিশিয়ে প্রতি গাছের জন্য একমুঠো সরষের খোল মিশিয়ে নেবে। গাছ সেমিবিশেক বড় হলে প্রতি গাছে আধমুঠো সরষের খোল দেবে এবং গাছে কুঁড়ি এলে প্রতি গাছে দেবে একমুঠো করে স্টেরামিল। এগুলি করছ কিন্তু ফুল ফোটাবার গাছের বেলায়, কাটিং নেবার গাছে নয়। ফ্রেঞ্চ ও আফ্রো-ফ্রেঞ্চ গাঁদার খাবারের চাহিদা কম। এদের জন্য ব্যবহার করবে এই সারমাটি : দুই ভাগ বাগানের মাটির সঙ্গে মেশানো হবে একভাগ গোবরসার। এদের গাছে কুঁড়ি এলে প্রতি গাছে দেবে আধমুঠো করে স্টেরামিল।

গাঁদার পুরো গাছকে বা ডালিয়ার লেটকাটিংয়ের মতো কাটিং করে গাঁদাকে সামনের বছরের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায়। ফুল ফুটে গেলে গাছটিকে একটু স্যাঁতসেঁতে জায়গায় রাখবে, জমির গাছকে মাটিসুদ্ধ তুলে এ-রকম জায়গায় লাগাচ্ছ। তোমাদের ব্যবহার করা কিন্তু পরিষ্কার জল যেখানে গড়িয়ে গিয়ে মাটি ভেজা-ভেজা রাখে গাছ তুলে সেখানে লাগালে আলাদা করে বিশেষ জল দেবার দরকার পড়বে না। এ-রকম জায়গা না হলে গাছের প্রয়োজনমতো জল দিতে হবে। সামনের বছর বীজ বোনার নির্দিষ্ট সময়ের দিনপনেরো আগে এই পুরনো গাছের কচি ডাল থেকে কাটিং করে নেবে। এভাবে বছরের পর বছর ভাল গাছ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। এদের থেকে, এবং আগে বলা আফ্রিকান জায়ান্ট গাছ থেকে এত কাটিং পাবে যে, তোমার বাড়তি গাছ বন্ধুদের দিয়েও শেষ করতে পারবে না।

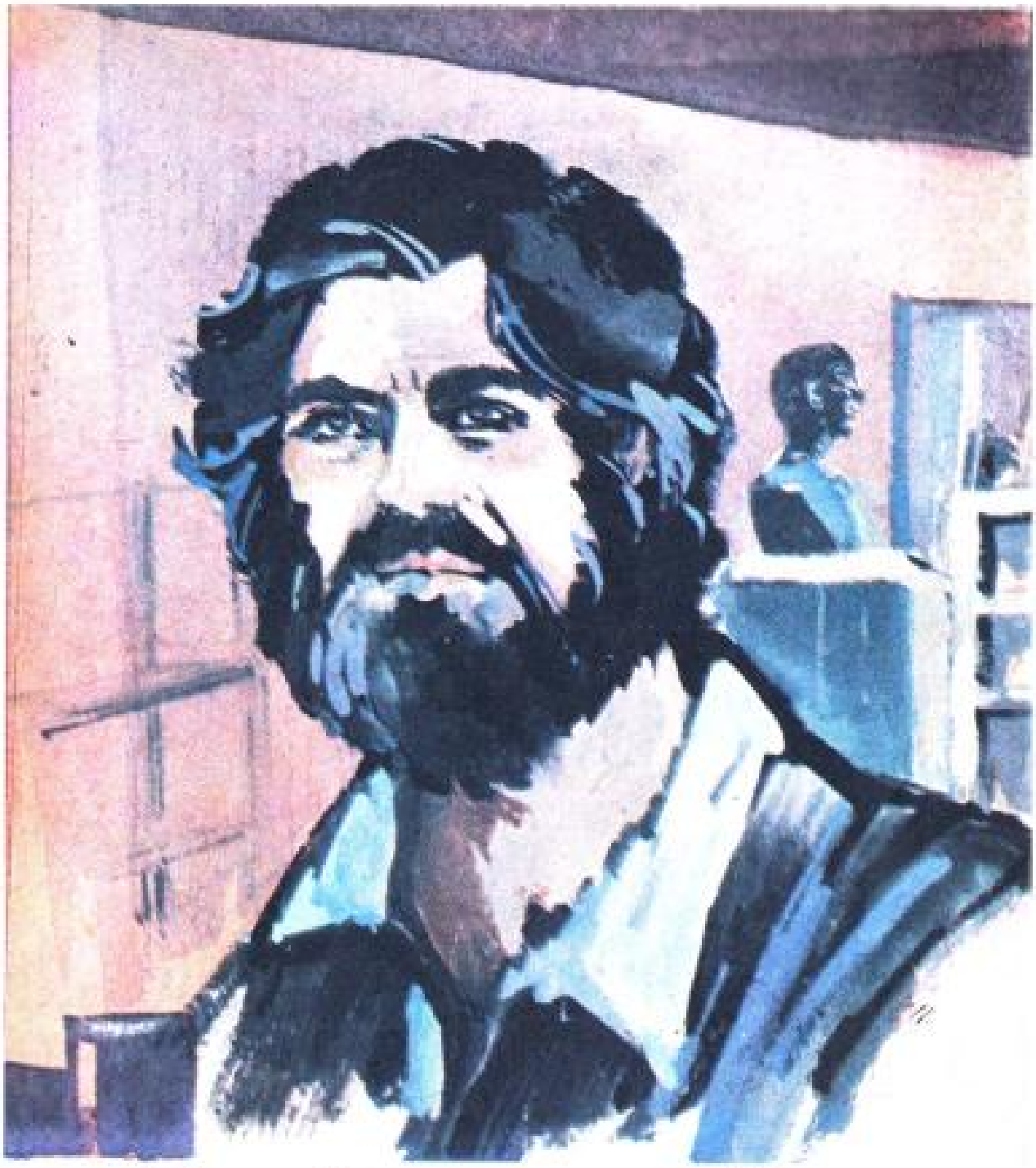

বিশে ডিসেম্বরের রাত্রি

চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ

আমি ছবি আঁকি। ওটাই আমার পেশা।

একটা সময় ছিল যখন লোকে আমাকে চিনত না, জানত না। কোনোদিন খাওয়া জুটত কি জুটত না। ছেঁড়া পোশাকে মোড়া সেই বিশ বছরের শীর্ণ তরুণকে তখন দেখা যেত শহরের এখানে-সেখানে — কাজের আশায়, দু' মুঠো খাবার যোগাড় করবার আশায়।

ছবি আঁকা শিখেছিলুম বাবার কাছে। কিন্তু ভাল করে শেখবার আগেই তিনি আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন চিরতরে। শহরের প্রান্তে একটা জরাজীর্ণ মাথা গোঁজবার জায়গা আর বাবার আঁকা কিছু ছবি, এইটুকুই সেই সব হিমেল দিনে আমার শান্তির আশ্রয় ছিল।

আজ আমার অভাব নেই। পোর্ট্রেট-আঁকিয়ে হিসেবে শুধু এ-শহরেই নয়, বাইরেও অনেকে আমাকে চেনে। আমার আঁকা পোর্ট্রেট ঘরে রাখাটা আজ অনেকের কাছে গর্বের, সম্মানের। আমার রং-তুলি আমাকে অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা সবই দিয়েছে। আমার হাত দুটো আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে।

কথাটা ভুল। আমার রং-তুলি নয়, হাত নয়। অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুর কথাটাই আমি লিখে রাখছি। আমার সেই কাপসা দিনগুলোর, একটা দিনের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি।

তিন-চার দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে একটা থিয়েটার পার্টির সিন এঁকে সেদিন পাঁচ টাকা দক্ষিণা পেয়েছিলাম। মনটা খুশি ছিল, কয়েকটা দিন অন্তত খেতে পাব। সেই খুশি নিয়ে সন্ধেবেলা ফিরলাম নিজের ডেরায়। তারিখটা ছিল বিশে ডিসেম্বর, আমার স্পষ্ট মনে আছে।

ঘরে ফিরে সবেমাত্র একটা কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়েছি, আমার ঘরের ভাঙা দরজায় ঠুক ঠুক করে টোকা পড়ল। আরো দুবার টোকা পড়ার পর উঠে গিয়ে দরজাটা

"দিদা, বাবা আজকে এতো দুষ্টুমি করছে কেন?"

"কেনরে ছোটন, কি করেছে?"

"লক্ষ্মী ছেলের মতো খাচ্ছেও না, আর মাকে বলছে, খাবার দেখলেই গা গুলোচ্ছে।"

"এটা খুবই স্বাভাবিক, ছোটন। তোমার বাবার পেটের গোলমাল কিনা, তাই আজ ও এমন খিটখিটে। আর, কিছু হজম করতে পারছে না বলে না খেয়েই থাকতে চাইছে।"

"কিন্তু দিদা, খাওয়া-দাওয়া না করলে তো বাবা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে—তাহলে কাজকে কাজে যাবে কী করে?"

"কিচ্ছু ভেবো না, ছোটন, আমি ঠিক জানি, ও কী খাবে।"

"কিন্তু দিদা, আমি তো তোমাকে বারবারই বলছি যে, বাবা কিচ্ছু খাবে না।"

"ঠিক খাবে। কারণ, আমি যা দেবো, সেটা হজম করতে ওর একে-বারেই কষ্ট হবে না। বলো তো কি? তাড়াতাড়ি বলতে হবে—তুমি তো এটা রোজই খাচ্ছ।"

"ওঃ! তুমি রবিনসন্স্ বার্লির কথা বলছো?"

"হ্যাঁ সোনা, তুমি ঠিকই বলছো, আমি রবিনসন্স্ বার্লির কথাই বলছি। এই বার্লি খুবই হালকা খাবার। খুব সহজেই হজম করা যায়। আর খাঁটি বার্লির সব গুণই এতে আছে।"

"কিন্তু এতে বাবা সেরে উঠবে কী করে?"

"ছোটন, অসুখ সারাতে ডাক্তার-বাবুর ওষুধ তো তাকে খেতেই হবে। আর তার সাথে, পেটের গোলমালে সবচেয়ে ভালো পথ্য হিসেবে ডাক্তার-বাবু তাঁকে রবিনসন্স্ বার্লিই খেতে বলবেন।"

"আচ্ছা, দিদা…"

"ওঃ, তুমি না বড্ড বেশী প্রশ্ন করো, এবার যাওতো ছুট্টে বাবাকে বার্লিটা দিয়ে এসো।"

"বাবা, বাবা, এই নাও তোমার বার্লি।"

রবিনসনস্ বার্লি

হালকা আর সহজে হজমের পথ্য

LINTAS:CI/ROB/2/1622 BG

টেনে খুলে দিলুম। বাইরে জড়সড় সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। ঐলো গলির সন্ধ্যাবাতির আলো সেখানে হারিয়ে গেছে।

আমার পিছনে-পিছনে ভদ্রলোক ঢুকে এলেন ঘরে। কুপির অনুজ্জ্বল হলুদ আলোয় যতটুকু দেখলুম, মনে হল — ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিত্তবান। দামি সার্জের পাঞ্জাবি, ঝিনঝিনে ধুতি, গায়ে জামদানি নকশাদার শাল। বহুমূল্য দুটি আংটি ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর হাতে। আমার আসবাবহীন, শ্রীহীন গরিবঘরে সম্পূর্ণ বেমানান ভদ্রলোককে কোথায় বসতে দেব ভেবে না পেয়ে ভাঙা চৌকিটাই দেখিয়ে দিলুম বসবার জন্যে। এক দামি আতরের গন্ধ তখন সারা ঘরে ম-ম করছে।

ভদ্রলোক বসলেন চৌকিতেই। বিন্দুমাত্র ভনিতা না করে বললেন, "তুমি আমাকে চেনো না, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। আসলে আমি শিবানুজের বন্ধু। তোমাকে অবিশ্যি আমি দেখেছি এই এতটুকুন। আমার নাম মোহিনী সান্যাল। প্রোফেসর সানিয়েল বললে বোধহয় তুমি আমাকে চিনবে। আমি বাইরে থাকি। বহু বছর পর এখানে এসে শিবানুজের খোঁজ করতে গিয়ে তোমার খোঁজ পেলুম। আমি একটা প্রয়োজনে এসেছি তোমার কাছে। শুনলুম তুমি ছবি আঁকো! কেমন আঁকো, দেখাবে?"

প্রোফেসর সানিয়েলের নাম সে-সময় কে না জানত? জাদুকর হিসেবে তখন তাঁর জুড়ি ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমার বাবার বন্ধু, তা আমি জানতাম না। ভদ্রলোকের আকস্মিক উপস্থিতি, কথাবার্তা, সব কিছু মিলিয়ে আমি বোধহয় কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলুম। তাড়াতাড়ি ক্যানভাসের তাড়া, কাগজের গোছা টেনে আনতে গেলুম ঘরের কোণ থেকে।

উনি বাধা দিয়ে বললেন, "ওসব দেখে

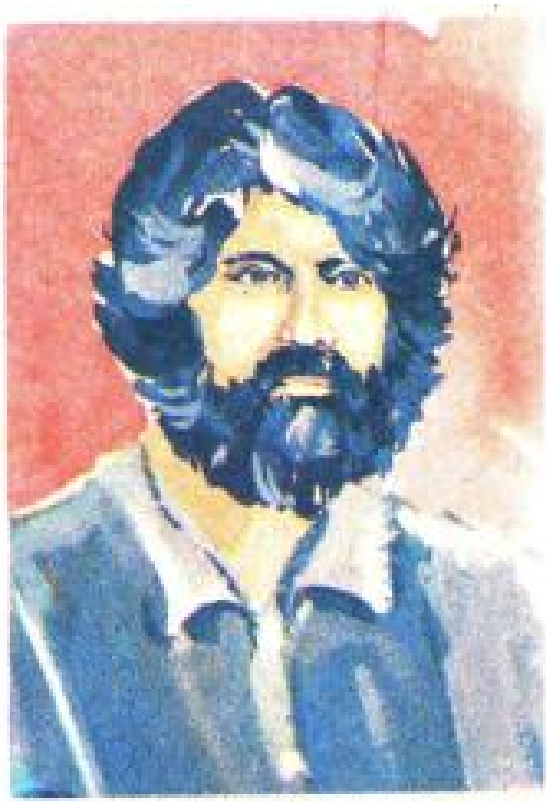

আমার লাভ নেই। আমি তোমার সামনে বসে আছি, আমার একটা স্কেচ করে দিতে পারবে?"

বললাম, "পারব।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই মলিন আলোয় ছায়া-ছায়া অন্ধকারে মোহিনী সান্যালের একটা স্কেচ করলাম মন-প্রাণ ঢেলে। আজ আর মনে করতে পারি না সে-ছবি কেমন হয়েছিল, কতখানি ভাল হয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোক খুশি হয়েছিলেন, খুব খুশি হয়েছিলেন।

নিজের ছবির কাগজটা হাতে নিয়ে পকেট থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিলেন মোহিনী সান্যাল। আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলুম না।

তারপর বললেন, "তোমাকে দিয়ে হবে।" বলে পকেট থেকে একটা খাম বার করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে, "এতে আমার পূর্বপুরুষের একটা ছবি আছে,

সেটার থেকে একটা বড় তেলরঙের ছবি করে দিতে পারবে ?"

ছবিটা না দেখেই বললাম, "পারব।"

উনি বললেন, "কাজটা করার কথা ছিল শিবানুজের। সে যখন নেই, তুমিই করো। কতদিন লাগবে ?"

কোনোকিছু না ভেবেই বললুম, "ধরুন মাসখানেক।"

"কিন্তু আমি তো অতদিন থাকব না। ঠিক আছে, আমি লোক পাঠিয়ে দেব, অথবা পরে যখন আসব নিয়ে যাব। আশা করি হাজারদুয়েক টাকা দিলেই তোমার পারিশ্রমিক ঠিক হবে।"

উনি আর আমার উত্তর শোনবার জন্য অপেক্ষা করলেন না।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে পাঁচশো টাকা হাতে পাওয়া মানে আমি তখন রীতিমত বড়লোক।

ছবিটা এক বৃদ্ধের ঝাপসা-হয়ে-আসা একটা ছোট্ট ছবি। বহু পরিশ্রমে সেই ছবি থেকে বড় একটা ছবি আমি আঁকলাম। সেটা শেষ হয়ে গেল দিন-কুড়ির মাথায়। আমার মনে হল এত নিখুঁত ছবি এর আগে কখনো আঁকিনি। আজ মনে হচ্ছে সারাজীবনে অত নিখুঁত ছবি আমি আর আঁকতে পারিনি।

ক্রমে এক মাস হতে গেল। কিন্তু কেউ এল না ছবি নিতে। দু-মাস, ছ-মাস — একটা বছর প্রায় কেটে গেল। সে ছবি রয়ে গেল আমার কাছেই। মোহিনী সান্যালের ঠিকানাও যোগাড় করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।

বিশে ডিসেম্বর ঘুরে এল। ঢাকা সরিয়ে ছবিটা আমি দেখছিলাম সে-রাত্রে। কনকনে ঠাণ্ডার রাত, হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। আমার অবস্থা পাল্টায়নি। সে রাতেও আমার খাওয়া জোটেনি। তখন কত রাত জানি না, ছেঁড়া কাপড় গায়ে জড়িয়ে দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে ছবিটার সামনে বসে থাকতে থাকতে একটুখানি তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ মনে হল কে যেন ডাকল, "রামানুজ !"

চমকে উঠে দেখলাম এধার-সেধার — কেউ নেই। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ধারালো ছোরার মতো আমূল বিঁধে যাচ্ছে আমার অবশ শরীরে। ভাবলাম সারাদিন না-খাওয়া শরীরে মনের প্রমাদ ঘটতেই পারে।

কিন্তু না, পরিষ্কার আমার নাম ধরে ডাকছে কেউ। আবারও চমকে উঠলাম, গলাটা মোহিনী সান্যালের। আমার ওঠবার মতো ক্ষমতা ছিল না। দরজা খুলে কেউ এলও না। কিন্তু ঠিক আমার পাশ থেকে সেই অপার্থিব কণ্ঠস্বর বললে, "আমি ফিরে আসতে পারিনি বলে ছবিটা নেওয়া হয়নি, তোমার পারিশ্রমিকও দেওয়া হয়নি। কিন্তু যে পরিশ্রম তুমি করেছ, তার পুরস্কার পাবে তুমি। ওই ছবিটা তুমি তোমার কাছেই রেখে দিও। দেখবে তোমার কোনো অভাব

লিনটাস-L/PS-1812 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

থাকবে না। কিন্তু দেখো, ও ছবি দ্বিতীয় কোনো লোক না দেখে কোনোদিন। যেদিন দেখবে ওই ছবি বিবর্ণ হয়ে গেছে — সেদিন জানবে তোমার দিন ফুরিয়েছে।"

আর কিছু শুনতে পেলুম না, কিন্তু দামি আতরের গন্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল। আমি চুপচাপ বসে থাকলুম। রাত শেষ হয়ে গেল একসময়।

পরে, অনেক পরে জানতে পেরেছিলুম, মোহিনী সান্যাল সেই বিশে ডিসেম্বরেই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন।

তারপর ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে আজকের এই রামানুজ মজুমদার। সে-ছবিটা আমি কাছছাড়া করিনি। বাইরের কেউ জানে না ছবিটার কথা। মাঝে মাঝে শুধু ঢাকা খুলে দেখেছি ছবিটা ঠিক আছে কি না।

দিন-দুয়েক আগে বিকেলবেলা কী মনে হল, ছবিটার ঢাকা সরালাম। ডুবন্ত সূর্যের গলন্ত সোনার মতো আলোর ঝলকে ঝলসে উঠল ছবির বৃদ্ধের হাসিখুশি মুখ। ঠিক এমনি সময়েই আমার দুই সাংবাদিকবন্ধু এসে হাজির। ওঁদের আসবার কথা ছিল, ভুলেই গিয়েছিলাম। ছবিটা সরাবার অবকাশ হয়নি।

ওঁরা অপলক তাকিয়ে থাকলেন ছবিটার দিকে। তারপর দুজনেই দারুণ উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠলেন, "এত নিখুঁতভাবে নিজের ছবি আঁকা যায়, এই প্রথম দেখছি। সত্যি আপনার তুলনা নেই রামানুজবাবু।"

আমি চমকে উঠলাম। নিজের ছবি — মানে ওটা আমার ছবি ? অবিশ্বাস্য। ওটা মোহিনী সান্যালের দেওয়া ছবি থেকে আমি এঁকেছি চল্লিশ বছর আগে। ওঁদের দুজনকে কোনোমতে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে বড় আয়নাটা নিয়ে এলুম। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ইঞ্চি-ইঞ্চি মিলিয়ে দেখলাম, ওঁরা ভুল করেছেন। ও ছবি আমার নয়। কিছুতেই নয়। কিন্তু হঠাৎ সেই এক বিশে ডিসেম্বরের রাতে শোনা অপার্থিব কণ্ঠের সাবধানবাণী মনে পড়ে গেল — এ-ছবি যেন দ্বিতীয় কেউ না দেখে !

সেদিন থেকেই কেমন এক ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এবার বুঝি আমার সময় শেষ হয়ে এল। কোন্‌দিন দেখব ছবিটা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেছে !

এ ক'দিন আমি কোথাও যাইনি। কারও সঙ্গে দেখা করিনি। সারাক্ষণই বসে থেকেছি ছবিটার সামনে। ঘুমোতেও পারিনি।

আজ বিশে ডিসেম্বর। আজ সেই দিন, যেদিন মোহিনী সান্যাল এসেছিলেন আমার কাছে। আমার মন বলছে আজ কিছু একটা ঘটবে। এখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। আমি ছবিটার সামনে বসে আছি। ছবিটা এখনও জ্বলজ্বল করছে। শুধু সেই চল্লিশ বছর আগে পাওয়া আতরের গন্ধটা আজ সারাদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। এখন ওটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে — আমার শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে সে গন্ধে।

বিখ্যাত শিল্পী রামানুজ মজুমদারের ডায়েরির শেষ কটি পাতার উপরের লেখাটি পাওয়া গিয়েছিল। ২২ ডিসেম্বর পুলিশ রামানুজ মজুমদারের বন্ধ স্টুডিওর দরজা ভেঙে ওঁকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে। ওঁর মৃতদেহ মেঝের ওপর পড়ে ছিল। মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, মৃত্যুর মুহূর্তে উনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন। ওঁর মৃতদেহের ঠিক সামনে ইজেলের ওপর একটি বড় ক্যানভাসে ওঁর নিজের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে — প্রচণ্ড ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া মুখ — ঠিক যেন ওঁর মৃত্যুর আগের ছবি। কিন্তু ছবিটি বহু পুরনো, বিবর্ণ। বিস্তারিত তথ্যের জন্য পুলিশ সমস্ত ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে দেখছে।

ছবি : আবদুল হামিদ

ফ্ল্যাশ গর্ডন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

ব্যাট-বলের গল্প ? ঝুড়ি ঝুড়ি বলা যায়। ঠিক কবে ক্রিকেটের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল মনে নেই। টেস্ট-ক্রিকেটের শেষ খেলা খেলেছি বাইশ বছর আগে। তারপর 'নিয়মিত ক্রিকেট' থেকে সরে এসেছি—তাও অনেক বছর হল। পুরনো দিনের সব কথা এখন আর মনে নেই। তবু যা আছে, সব গুছিয়ে লিখে ফেলতে পারলে এত মোটা একটা বই হয়ে যেত ! কত দিন ভেবেছি ঘটনাগুলো লিখে রাখব, কিন্তু চারদিকে এত কাজের চাপ যে, ঠাণ্ডা মাথায় বসে সেগুলো গুছিয়ে লেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমার মাঝে-মাঝে ভারী দুঃখ হয় এই ভেবে যে, গল্পগুলো একদিন হয়তো হারিয়ে যাবে।

সব গল্প, সবার গল্প শোনানো তো সম্ভব নয়। তাই আমার জীবনের কিছু উজ্জ্বল মুহূর্তের কথাই তোমাদের শোনাব বলে ঠিক করেছি। সেই সব মুহূর্ত আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রত্যেক ক্রিকেটারেরই ইচ্ছে হয় একদিন সে বড় খেলোয়াড় হবে। টেস্ট খেলবে। ছেলেবেলা থেকে আর সকলের মতো আমারও স্বপ্ন ছিল টেস্ট খেলার। কিন্তু টেস্ট খেলব বললেই তো আর টেস্ট খেলা যায় না। তার জন্য দরকার ভাল খেলা। জাতীয় দলে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলতে হবে, তাহলেই হয়তো সুযোগ পাওয়া যাবে টেস্ট খেলায়।

১৯৫১-৫২ সালে নাইজেল হাওয়ার্ডের অধিনায়কত্বে ইংল্যাণ্ড দল ভারত-সফরে এসেছিল। সফরের আগে আমাদের জন্য একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছিল খাড়াকভাসলায়। খাড়াকভাসলার নাম তোমাদের অনেকেই হয়তো জানো। জায়গাটা পশ্চিম ভারতে। পুনে থেকে আরও পনেরো-ষোলো মাইল ভেতরে। খাড়াকভাসলায় মিলিটারি মাঠে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। মনে আছে, সেটা ছিল পুজোর সময়। প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য বাংলা থেকে আমরা পাঁচজন ডাক পেয়েছিলাম— প্রবীর সেন, মন্টু ব্যানার্জি, পুঁটু চৌধুরি, প্রেমাংশু চ্যাটার্জি আর আমি। আমার ডাক পাওয়ার কারণ হচ্ছে সে বছর আমি প্রচুর রান করেছিলাম। শুধু রানই নয়, পুরনো রেকর্ড ভেঙে নতুন অনেক রেকর্ড তৈরি করেছিলাম আমি।

ভারতবর্ষের সব প্রদেশ থেকে নামী এবং সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের ক্যাম্পে ডেকে আনা হয়েছিল। বিজয় মার্চেণ্ট, রুসি মোদি, মুস্তাক আলি, পলি উম্রিগড়, দাত্তু ফাদকার, সুভাষ গুপ্তে, ভিনু মাঁকড়ের মতো বাঘা ক্রিকেটার থেকে শুরু করে আমার মতো খেলোয়াড়রা পর্যন্ত। এক মাসের ক্যাম্প। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন স্বনামখ্যাত বার্ট ওয়েন্সলি। সেখানে ফিজিক্যাল ট্রেনিং নিতে হত। ব্যাটিং বোলিং ও ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করানো হত

মলটোভা দল—
দুরন্ত...দুর্নিবার,
ওদের মতলব আন্দাজ করা ভার!
নিয়মিত মলটোভা খাওয়া বাচ্চার দল ...কিবা স্কুলে, কিবা খেলাধুলায় সর্বদাই প্রাণ-চঞ্চল। কারণ মলটোভা মানেই এক চমৎকার খাদ্য। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে মলটোভা খেতেও যেমন দারুণ আর যোগায়ও ভরপুর পুষ্টি।
সোনালী রোদে পাকানো সোনা সোনা গম আর বার্লির মল্ট
পাঞ্জাবের সরেস ক্ষেতের গম আর বার্লি মিলিয়ে মিশিয়ে মলটোভা প্ল্যান্টে বানানো। পুষ্টিকর মল্ট আর তার সঙ্গে শরীরের দরকারি খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন B মিলিয়ে যে সহজ-পাচ্য খাদ্যটি তৈরী হ'ল, তা বাচ্চাদের দিনে দিনে সবল স্বাস্থ্য গড়ে তুলবে।
খাঁটি, পুষ্টিকর দুধ
মলটোভার দুধ আমাদের নিজস্ব দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে আসে। সর্বদাই পুরো ১০০% খাঁটি ও পুষ্টিকর।
দারুণ স্বাদের কোকো
বিদেশ থেকে আনানো সরেস জাতের কোকো দিয়ে মলটোভা বানানো... যা আপনার বাচ্চাদের খেতেও লাগবে দারুণ আর পাবে সেরা পুষ্টিকর গুণ। কোকো শরীরের ক্লান্তি দূর করে আর আরাম এনে দিতে সাহায্য করে।
চিনি মানে প্রাণ-প্রাচুর্যের খনি
সরেস আখের খাঁটি, সাদা সাদা বড় দানার চিনি দিয়ে মলটোভা বানানো হয়। বাড়ন্ত বাচ্চাদের বাড়তি শক্তির জন্যে এটা খুবই দরকারি।
ভিটামিনের বিশেষ গুণে ভরপুর
মলটোভা হ'ল প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের মিলনে তৈরী এক চমৎকার খাদ্য। এছাড়া, এটি ভিটামিন A, নিয়াসিন, ভিটামিন B_1 ও ভিটামিন D_2 -এর বাড়তি গুণেও ভরপুর। আরো কি জানেন, এতে কোনরূপ কৃত্রিম স্বাদ-গন্ধেরও বালাই নেই।
Maltova
Maltova
JIL জগৎজিত ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে মণ্ড (বিশ্ব) নির্বাচনে স্বর্ণপদক বিজয়ী।
ভিটামিনে ভরপুর মলটোভা : স্বাস্থ্য, শক্তি ও উদ্যমের জন্যে
SIMOES/JIL/1/83 BN

বেশ জোর দিয়ে। ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের দিকটা অবশ্য বাট ওয়েল্সলি দেখতেন না। সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন একজন মিলিটারি অফিসার। বাকি সবকিছুর তত্ত্বাবধান করতেন ওয়েল্সলি স্বয়ং। ভারী কড়া ধাতের মানুষ ছিলেন এই ওয়েল্সলিসাহেব! নিয়ম-শৃঙ্খলার এতটুকু নড়চড় হওয়ার জো নেই। সাহেব তো আমাদের রোজ পঞ্চাশ বার করে শোনাতেন, পৃথিবীতে নিয়ম-শৃঙ্খলা না মেনে চললে কখনোই বড় হওয়া যায় না। তাই বড় হতে গেলে, বড় কিছু করতে গেলে, ওটা মেনে চলতেই হবে। তেমনি ওই ফৌজি অফিসার। কী তাঁর মিলিটারি মেজাজ! পান থেকে চুন খসলেই তর্জন-গর্জনে এক ভীষণ কাণ্ড বেধে যেত!

এই রকম কড়াকড়ির মধ্যে প্র্যাকটিসটা ভাল হচ্ছিল ঠিকই। কিন্তু আমার মনে বারবার একটা প্রশ্ন উঁকি মারছিল। প্র্যাকটিস তো জোর কদমে চালিয়ে যাচ্ছি, টেস্টে চান্স পাব কি? যে-সব প্লেয়ার ক্যাম্পে রয়েছেন, তাঁদের ডিঙিয়ে টেস্ট দলে আসতে পারব বলে মনে হয় না। হাজারে, মার্চেন্ট, মুস্তাক, উদ্রিগড়, মোদি, মাঁকড়— এঁদের মধ্যে জায়গা করে নেওয়া সত্যিই খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যাই হোক, ভয় থাকলে কিছুই হবে না ভেবে নিজেকে অন্যরকম বোঝাতে শুরু করলাম। চান্স না পাই না পাব, কিন্তু ভাল আমাকে খেলতেই হবে।

প্রতি শনি ও রবি আমাদের ম্যাচ খেলতে হত। নিজেদের মধ্যে দুটো দল করে খেলা হত, দুদিন ধরে। এই ট্রায়ালে যে দুটো দল খেলত তার মধ্যে একটার নাম ছিল বিজয় মার্চেন্টের একাদশ। অন্যটা মুস্তাক আলির একাদশ। নির্ধারিত এক মাস সময়ে চারটে ট্রায়াল ম্যাচ খেলা হয়েছিল। চারটে ম্যাচেই আমি বিজয় মার্চেন্টের একাদশের হয়ে খেলেছিলাম। প্রথম

পঙ্কজ (বল বাউন্ডারি পার)

ট্রায়ালে অধিনায়ক মার্চেন্ট আমায় চমকে দিলেন। দলের ইনিংস শুরু হওয়ার আগে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তো দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ব্যাট করতে আমার অনেক দেরি। ও, বলতে ভুলে গেছি, তখন নিয়মিত ওপেনার বলতে যা বোঝায়, তা

আমি ছিলাম না। ব্যাটিং অর্ডারের মাঝামাঝি জায়গায়, সাধারণত ব্যাট করতে যেতাম। সুতরাং ইনিংসের শুরুতে আমার কোনো ভূমিকাই ছিল না। মার্চেন্টের তলব পেয়ে একটু ঘাবড়ে গেলাম। ব্যাপারটা কী? গুটি গুটি হাজির হলাম মার্চেন্টের সামনে। আমাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে মার্চেন্ট বললেন, "তাড়াতাড়ি প্যাড পরে নাও পঙ্কজ। একটুও দেরি কোরো না।"

আমি তো অবাক! আমার তাড়াতাড়ি প্যাড পরার কথা নয়। "সে কী! এখনই প্যাড পরব কেন?"

"কারণ আজ তুমি ওপেন করতে যাচ্ছ।" মার্চেন্ট মৃদু হাসলেন। ক্যাপ্টেনের আদেশ, সুতরাং প্যাড-ট্যাড পরে মাঠে যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। ব্যাট হাতে ক্রিজের দিকে যখন এগোচ্ছি তখন আমার মাথায় কেবল একটা কথাই ঘুরছে। টেস্টে চান্স পাই আর না পাই, ভাল আমাকে খেলতেই হবে। নাক বাঁকিয়ে প্রথম রাউণ্ডেই আমাকে বাতিল করে দেবার কোনো সুযোগ দেব না। মনে মনে আমি তৈরি হয়ে নিলাম।

প্রথম ট্রায়ালে আমি যখন অপরাজিত ১৩৮ রান করে ফিরে এলাম ক্যাপ্টেন আমার হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, 'শাবাশ'। সেঞ্চুরি পেয়ে আমারও খুব ভাল লাগছিল।

দ্বিতীয় ট্রায়ালেও হয়তো সেঞ্চুরি পেয়ে যেতাম। বাদ সাধলেন ডি কে গায়কোয়াড়। সেঞ্চুরি পূর্ণ হতে বাকি ছিল মাত্র চার রান। একটা আলগা বল পেয়ে জোরে ব্যাট চালালাম। সপাটে ড্রাইভ। বলটা কভার-এক্সট্রা কভারের মাঝখান দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। রান নিতে ছুটলাম আমি। কভারে দাঁড়িয়ে ছিলেন গায়কোয়াড়। ডান দিকে ঝুঁকে পড়ে কীভাবে যে বলটা থামালেন, তিনিই জানেন। মাঝরাস্তায় পৌঁছবার আগেই দেখলাম, উইকেট তাক করে বল ছুঁড়ে দিয়েছেন গায়কোয়াড়। পড়িমরি করে ছুটে ফিরে যেতে চাইলাম নিজের ক্রিজে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। গায়কোয়াড়ের হাতের বল তার আগেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। সুতরাং ৯৬ রানেই প্যাভিলিয়নে ফিরতে হল আমাকে। ক্যাপ্টেন পিঠ চাপড়ালেন, সতীর্থরা অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু আমি শান্তি পেলাম না একটুও। ইস্, মাত্র চারটে রানের জন্য ফসকে গেল সেঞ্চুরিটা!

ভেবেছিলাম, তৃতীয় ট্রায়ালে দুঃখটা পুষিয়ে নেব। পঞ্চাশ পেরোবার পরে খুব সতর্ক হয়ে খেলতে লাগলাম। কিন্তু ৫২ রানের মাথায় ক্যাপ্টেন আমায় ডেকে নিলেন। "চলে এসো। খুব চমৎকার খেলেছ তুমি। এবার পরের ব্যাটসম্যানকে সুযোগ দাও।"

খুব অবাক হয়ে গেলাম। সে কী! আমি যে সেঞ্চুরি করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম! যাই হোক, ক্যাপ্টেনের ওপর তো কোনো কথা চলে না, তাই ব্যাজার মুখে প্যাড খুলে ফেলতে হল।

চতুর্থ ও শেষ ট্রায়ালেও ৫৪ রানের পরে আমাকে ডেকে নেওয়া হল। আমার ব্যাটিং দেখে বার্ট ওয়েন্সলি পর্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। ক্যাম্প শেষ হলে আমায় ডেকে বলেছিলেন, "এই এক মাসের মধ্যে তোমার যে উন্নতি দেখা গেছে তা খুব সন্তোষজনক। এখন তুমি ভারতীয় দলে জায়গা পেলে আমি মোটেই আশ্চর্য হব না।" বলা বাহুল্য, ওয়েন্সলির মন্তব্য শুনে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

চারটে ইনিংসের রান-সংখ্যা, শিবিরের অন্যান্য সদস্যদের প্রশংসা আর তত্ত্বাবধায়কের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল যুদ্ধের প্রথম দফায় আমি জিতেছি। নির্বাচনের আসরে কেউ আমাকে আর চট করে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দিতে পারবে না।

এর কিছুদিন পরেই দলবল নিয়ে এসে গেলেন নাইজেল হাওয়ার্ড। টেস্ট দলে ঢুকেই ক্যাপ্টেন হয়েছেন— এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব কম। নাইজেল হাওয়ার্ড সেই কমসংখ্যক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। সেই প্রথম এম সি সি দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন হাওয়ার্ড। এবং হয়েই ক্যাপ্টেন। কী দারুণ ভাগ্য, বলো!

সফরে এম সি সি দলের প্রথম খেলা ছিল সর্ব-ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের বিরুদ্ধে। সেবার বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি। আর কর্নেল সি কে নাইডু ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় দল নির্বাচন-সমিতির সভাপতি। খেলার দিন সকালে সি কে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "যদি ব্যাট করতে পাও, তুমি কত নম্বরে যাচ্ছ?" আমি চিন্তায় পড়লাম। এখন এ প্রশ্ন কেন? তারপর কোনোরকম ভনিতা না করে আমি আমার সিদ্ধান্ত জানালাম তাঁকে। "ভেবেছিলাম ওপেন করতে যাব।"

সি কে নাইডুর ভুরুটা সামান্য কুঁচকে গেল। কথাটা শুনে খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। ব্যক্তিত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন? তুমি তো সাধারণত ওপেন করো না। আমার বেশ মনে আছে, হোলকারের বিরুদ্ধে তুমি চমৎকার সেঞ্চুরি করেছিলে। খেলতে নেমেছিলে ছ-নম্বরে। মিডল অর্ডারে তুমি তো ভালই খেলতে পারো। তবে আজ ওপেন করতে যাওয়ার কথা ভাবলে কেন?"

আমি বুঝলাম খাড়াকভাসলায় আমাদের ক্যাম্পের কথা সি কে জানেন বটে, কিন্তু ক্যাম্পে আমি কেমন খেলেছি সে-সম্পর্কে কোনো খবর পাননি। আমি ক্যাম্পের কথা বিস্তৃতভাবে জানালাম। আমাকে জোর করে ওপেন করতে পাঠানোর কথা বললাম। চারটে ইনিংসে আমার সংগৃহীত

বিজয় হাজারে (রানের মোশন)

রানের কথা বললাম। আরও বললাম, এই সাফল্যের ভিত্তিতেই এ-ম্যাচে ওপেন করতে যেতে চাই। সব শুনেও সি কে বিশেষ খুশি হলেন না। মাঠের দিকে তাকিয়ে আলগাভাবে বললেন, "তুমি দলের ক্যাপ্টেন। যা ভাল বোঝো করো।"

সি কে-র কাছ থেকে সরে এলাম। কিন্তু নাইডুর কথাবার্তা আমার মনে জেদ এনে দিল। আজ আমি ওপেন করবই। এবং দেখিয়ে দেব, ওপেনার হিসেবেও আমি যথেষ্ট ভাল খেলতে পারি। শুধু তাই নয়, আরও একটা কারণে মনকে শক্ত করে ফেলেছিলাম। সেই দিনই এম সি সি-র বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের জন্য ভারতীয় দল

"বালী বালী, শক্ত দানার টুথ পাউডার আপনার দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি করতে পারে..."

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.10 BN

ঘোষিত হওয়ার কথা। যদি ভাল খেলতে পারি তবে দলে আসার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব নয়। প্রথম দফার যুদ্ধে জিতলেও এ-রাউণ্ডে হেরে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। কাজেই, আজ আমাকে ভাল খেলতেই হবে।

খেলা হয়েছিল ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে। রোদ-ঝলমল সকালে মাধব আপ্তেকে নিয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে গেলাম। মাঠে সর্বভারতীয় নির্বাচকরা উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পের সাফল্যে তাঁরা এমনিতেই আমার ওপর খুশি ছিলেন। আরও খুশি হলেন সে-দিনের ব্যাটিং দেখে। বিকেলের দিকে ৮৭ রানে আউট হয়ে গিয়েছিলাম। প্যাভেলিয়নে ফেরার পরে সবাই আমাকে খুব অভিনন্দন জানালেন। ওপেনার হিসেবে আমি নাকি আমার ভূমিকা চমৎকারভাবে পালন করেছি। আমি খুশি হলাম এই ভেবে যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পেরেছি। এখন চিন্তা, টেস্টে চান্স পাব কি না।

এবার টেস্টে চান্স পাওয়া না-পাওয়া কপালের ব্যাপার— এ-সব ভাবতে ভাবতে স্নানঘরে ঢুকে গেলাম। মিনিট-দুয়েক পরেই শুনি বাইরে থেকে সাংবাদিক ডিকি রত্নাগর চেঁচাচ্ছেন— "কনগ্র্যাচুলেশনস্ পঙ্কজ।"

ভাবলাম, আজকের ইনিংসটার জন্য বুঝি। কিন্তু ডিকির পরের কথাটা আমার কানে মধু ঢেলে দিল। "দিল্লিতে প্রথম টেস্টের জন্য তুমি নির্বাচিত হয়েছ।"

এক মুহূর্তের জন্য আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম। আনন্দের ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এত আনন্দ হচ্ছিল যে, কিছুক্ষণের জন্য আমি সারা পৃথিবীর সব কিছু ভুলে গেলাম। আহ্! কী দারুণ সংবাদ! অবশেষে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমি টেস্ট খেলব— টেস্ট-ক্রিকেট! ছেলেবেলার কল্পনার ছবিটা আজ বাস্তব হয়ে উঠেছে। সবুজ মাঠ, ব্যাট-বল, প্রতিপক্ষ, টেস্ট। সবুজ ভেলভেটের মতো মাঠে আমি ব্যাট করছি। দারুণ, দুর্দান্ত।

আচ্ছা, দিল্লিতে কি সত্যিই সেরকম দুর্দান্ত ব্যাটিং করতে পারব? হাত-পা কেমন যেন অসাড় লাগছিল। হঠাৎ মনে হল, সুখবরটা যিনি দিলেন সেই ডিকিকে তো ধন্যবাদটুকুও দেওয়া হল না। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, "ধন্যবাদ ডিকি।"

আমার ক্রিকেট-জীবনে কত ঘটনাই তো ঘটেছে। কিন্তু কিছু-কিছু ঘটনার স্মৃতি এত সজীব যে চোখ বন্ধ করলেই আমি সেগুলো স্পষ্ট দেখতে পাই পরপর সাজানো ছবির মতো। একেবারে জীবন্ত, যেন এই তো সেদিন ঘটল! (ক্রমশ)

গোয়েন্দাকাহিনীর লেখিকা আগাথা ক্রিস্টি আমেরিকা থেকে পেলেন সাহিত্য-অস্কার। পুরস্কার একটি সোনালি মূর্তি—কাঙারুর প্রতীক। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ফেরবার সময় লেখিকা আটকে গেলেন কাস্টমসের বেড়ায়। সন্দেহ—তাঁর গল্পের আসামিদের মতো হয়তো তিনি সোনা পাচার করছেন!

লোভের সাজা

সন্ধ্যা দত্ত

রোজ দুপুরে মুকুল এক বাটি দুধ আর কলা নিয়ে চুপিসারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে বাগানের আমগাছের কোটরে নকুল-বন্ধুর কাছে। সেদিন দুধের বাটি হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুকুলকে দেখে নকুল-বন্ধু জিজ্ঞেস করল, "তোমার হাতে আবার কী হল ভাই!"

মুকুল বলল, "জানো! মা বলেন লোভে পাপ, তাই লোভ করতে নেই। শুনে তখনকার মতো মনে হয়, ঠিক কথা—আর লোভ করব না। কিন্তু দুপুরে মা কাজকর্ম সেরে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই আমার যেন সব ওলট-পালট হয়ে যায়। তাই তো আজ চুরি করে আচার খেতে গিয়ে আচারের বোয়মটা গেল ভেঙে, আর সেই ভাঙা কাঁচে হাত লেগে হাতটা কেটে গেল অনেকখানি। দ্যাখো! লোভ করতে গিয়ে কী দশাই হল।"

শুনে নকুল-বন্ধু বলে উঠল, "তোমার তো ভাই হাত কেটেছে, জোড়া লেগে যাবে। কিন্তু লোভ করতে গিয়ে সাপেদের জিবটাই দু-ভাগ হয়ে গেছে—সেটা আর কখনোই জোড়া লাগবে না ভাই।"

শুনে মুকুল বলল, "তারা আবার কী চুরি করতে গিয়েছিল?"

নকুল বলল, "চুরি তো তারা করেনি

ভাই, করেছিল তাদের পূর্বপুরুষেরা আর তারই ফল তারা ভোগ করছে। সে অনেক কথা, আর একদিন বলব তোমাকে। এখন দুধ-কলাটা দাও তো! খেয়ে নিই। গলা একদম শুকিয়ে গেছে।"

মুকুল দুধের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে নকুলকে বলল, "দুধটা খেয়ে নিয়ে কিন্তু গল্পটা তোমাকে এক্ষুনি বলতে হবে। আজ আমি গল্প না শুনে বাড়ি ফিরছি না।" অগত্যা বন্ধুকে নাছোড়বান্দা দেখে চুক-চুক করে দুধ খাওয়া সেরে নকুল বলতে শুরু করল, "তুমি তো লেখাপড়া করছ, কশ্যপমুনির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁর ছিল দুই স্ত্রী কদ্রু আর বিনতা। বিনতার দুই ছেলের মধ্যে গরুড় ছিল মহাশক্তিধর। কদ্রু ছিলেন সহস্র নাগের জননী। কোনো এক বিষয়ে বাজিতে হেরে গিয়ে বিনতা কদ্রুর দাসী হয়ে তাঁর সেবা করতে থাকে। পুত্র গরুড় মায়ের এই অবস্থা দেখে মনে বড় কষ্ট পায়। তাই একদিন সে বিমাতাকে জিজ্ঞেস করল, কী পেলে মায়ের দাসীত্ব মোচন হতে পারে। কদ্রু বলল, স্বর্গলোক থেকে সুধা এনে যদি তুমি আমাদের দিতে পারো, তবেই তোমার মাকে আমি মুক্তি দিতে পারি। শুনে গরুড় প্রথমে একটু দমে গেল। কারণ স্বর্গের সুধা এত দুর্গম স্থানে যে তা আনতে বহু বাধা-বিপত্তি তো আছেই, উপরন্তু বিনা যুদ্ধে দেবতারা সুধাভাণ্ড গরুড়কে ছেড়ে দেবেন না। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর গরুড় ঠিক করল—সুধা তাকে আনতেই হবে, না হলে তার মাকে সারাজীবন কষ্ট পেতে হবে। সুতরাং গরুড় তৈরি হয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সুধা আনতে রওনা হল।

"এদিকে গরুড়ের আসার খবর পেয়ে দেবতারা যে যার অস্ত্র নিয়ে গরুড়ের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। গরুড় বীর-বিক্রমে দেবতাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেবতাদের গা-হাত-পা ধারালো নখ ও ঠোঁট দিয়ে চিরে দিতে লাগল। দেবতারা প্রাণপণে যুদ্ধ করেও গরুড়ের পাখার ঝাপটে টিকতে না পেরে সব পালাতে আরম্ভ করলেন। এভাবে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে পরাস্ত করে গরুড় চন্দ্রলোকে এসে উপস্থিত হল। সেখানেও বাধা।

"চতুর্দিকে জ্বলন্ত অগ্নি। উপায়ান্তর না দেখে গরুড় তখন সোনার অঙ্গ ধারণ করে আগুন পেরিয়ে এল। কিন্তু এত করেও গরুড় সুধাভাণ্ডের কাছে পৌঁছতে পারল না। এবারে এক তীক্ষ্ণধার চক্র তার পথ রোধ করল। মহাবিপদ! গরুড় ভাবনায় পড়ল। হঠাৎ দেখল চক্রের ঠিক মাঝখানে ছুঁচের মতো সামান্য ছিদ্র রয়েছে। মন্ত্রবলে

গরুড় তখন দেহকে ঐ ছিদ্রের চেয়ে ছোট করে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেল একেবারে সুধাভাণ্ডের কাছে। এরপর পাখার নীচে করে সুধাভাণ্ড নিয়ে গরুড় যখন ফিরে আসছে, সামনে চক্রপাণি নারায়ণ তার পথ আগলে দাঁড়ালেন। তিনি বিনা যুদ্ধে গরুড়কে যেতে দেবেন না। তখন আকাশপথে দুজনের ঘোরতর যুদ্ধ হল। গরুড়ের বিক্রমে নারায়ণ অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। গরুড় বলল, তুমি আমাকে এমন বর দাও যাতে তোমার চেয়ে আমার আসন সর্বদা উঁচুতে থাকে। নারায়ণ বললেন, বেশ। তাই হবে। বর পেয়ে গরুড় অত্যন্ত খুশি হয়ে নারায়ণকে পালটা বর দিতে চাইল। নারায়ণ বললেন, তুমি আমার রথের বাহন হলেই আমি খুশি।

"আকাশপথে সুধাভাণ্ড নিয়ে গরুড় যাচ্ছে। পথে দেবরাজ ইন্দ্র আবার তাকে বাধা দিতে এলেন বজ্রবাণ হাতে। গরুড় অবলীলাক্রমে ইন্দ্রের বজ্রবাণকে বিধ্বস্ত করে দিল। গরুড়ের পরাক্রমে ইন্দ্র আর পেরে না উঠে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। ইন্দ্র জানতে চাইলেন যে এত দুঃখ কষ্ট বরণ করে গরুড় কার জন্যে সুধা নিতে এসেছে। গরুড় বলল, আমার বিমাতা কদ্রু ও তার সহস্র সন্তানের জন্য এ সুধা আমার দরকার। তা না হলে আমার মাকে সারা জীবন দাসীরূপে কষ্ট পেতে হবে। ইন্দ্র বললেন, কিন্তু ভাই, নাগগণ অমৃত খেয়ে অমর হয়ে গেলে সমগ্র পৃথিবীর তো মহাবিপদ ঘনিয়ে আসবে—সেটা একবার ভেবেছ কি ? গরুড় বলল, কিন্তু আমি যে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাই, সুধা আমাকে নিতেই হবে। ইন্দ্র বললেন, শত্রুকে অমৃত খাওয়ানো মানে সকলেরই ক্ষতি করা—এ কাজ থেকে তুমি বিরত হও ভাই ! একটু ভেবে গরুড় বলল, এসো এক কাজ করা যাক। আমি সুধাভাণ্ড নিয়ে যখন বিমাতার কাছে রাখব, তুমি কৌশলে সেটি চুরি করে নিয়ে যাবে। তাতে আমারও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে, তোমারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এ প্রস্তাবে ইন্দ্র রাজি হয়ে গেলেন।

"এরপর সুধাভাণ্ডটি নিয়ে গরুড় নাগলোকে প্রবেশ করে বিমাতার সামনে এসে দাঁড়াল ও মায়ের দুর্দশার কথা পুনরায় বিমাতাকে স্মরণ করিয়ে দিল। সুধা পেয়ে কদ্রু খুশি হয়ে বিনতাকে দাসীত্বের পণ থেকে মুক্তি দিয়ে দিল। মায়ের মুক্তিলাভের পরে গরুড় সুধাভাণ্ডটি কুশের উপর রেখে চলে গেল। সুধা দেখে নাগসন্তানগণ ভাণ্ডের চারপাশে এসে সুধার লোভে ঘুর-ঘুর করতে লাগল। তাই দেখে কদ্রু বলল, সুধাভক্ষণ অতি পবিত্র কাজ। অতএব তোমরা সব স্নান করে শুচি হয়ে এসো, তারপর আমি তোমাদের সুধা ভাগ করে দেব। মায়ের কথায় নাগেরা স্নান করতে চলে গেল। ইন্দ্র তো তাক করেই ছিলেন। যেই নাগেরা চলে গেল, অমনি ইন্দ্র সুযোগ বুঝে সুধাভাণ্ডটি নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। নাগেরা স্নান সেরে এসে দেখে—তাদের এত সাধের সুধাভাণ্ড নেই। তারা হতাশ হয়ে বসে পড়ল। হঠাৎ দেখল যে কুশের উপর কিছু সুধা পড়ে আছে। দেখে লোভ সামলাতে না পেরে তারা কুশের উপরকার সুধা চাটতে শুরু করে দিল। আর যেই না চাটা অমনি ধারালো কুশের আগায় জিভ লেগে নাগেদের জিভ গেল চিরে।"

গল্প শেষ করে নকুল-বন্ধু মুকুলকে বলল, "সেই লোভেই সব সাপেদের জিভ চেরা।"

শুনে মুকুল ঠিক করল—না আর কখনো লোভ নয়। অবশ্য মুকুল এ প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরেছিল কিনা তা আমরা জানি না।

ছবি : অনুপ রায়

রুআহা

বুদ্ধদেব গুহ

আগে যা ঘটেছে : পূব-আফ্রিকায় এক পশু-চোরাইচক্রের সন্ধানে এসে ঋজুদা, রুদ্র ও তিতির রুআহা ন্যাশনাল পার্ক পেরিয়ে সিংহের গুহায় ডেরা বাঁধে। সেখানে তিন আততায়ী ঋজুদার গুলিতে প্রাণ হারায়। নিগ্রো সহকারী ডামু সার্গেসন ডবসন নামে এক সাহেবকে বেঁধে আনে, কিন্তু নিজে নিহত হয়। তার সিগারের প্যাকেটে খুদে ডিনামাইট। ডবসন বলে, মেরে ফেললেও সে কোনো খবর জানাবে না। তাকে গুহায় আটকে ওরা বেরিয়ে আসে। একটা সন্দেহজনক পাহাড়ের দিকে নজর রাখার জন্য গাছ খুঁজতে গিয়ে তিতির তিন শিকারি নিগ্রোর সঙ্গে ভাব জমিয়ে অনেক খবর জানতে পারে। তাদের সঙ্গী করে নেয় ওরা। সেই রাতেই অপরাধীদের সঙ্গে চূড়ান্ত মোকাবিলার সময় ঘনিয়ে আসে। অলক্ষ্যে আক্রমণে দু' তরফের দুজন মারা যায়। দূর থেকে ভুষুণ্ডার গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে রুদ্র টিলার পিছনে ঝুলে পড়ে। ভুষুণ্ডার সঙ্গী ওদিকে বিষতীর খেয়ে টেঁসে গেছে। রুদ্রর শরীরের ভারে গলায়-ফাঁস ভুষুণ্ডাও টেঁসে যেত। কিন্তু, ঋজুদা এসে বলে, তদন্তের স্বার্থে তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তারপর···

॥ ৩০ ॥

ঋজুদা ঘড়ি দেখল। নিজের মনেই বলল, 'বারোটা ! ঠিক আছে। যথেষ্ট সময় আছে। এখানে আয় এক মিনিট।' টিলাটার ভিতরের গুহাতে গিয়ে চক্ষু স্থির হয়ে গেল। দেখি দুটো মেশিনগান দোপায়ায় বসানো। ঝকঝক করছে টর্চের আলো পড়ে।

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, "ছুঁড়েছিস কখনও ?"

"এন-সি-সিতে একবার ছুঁড়েছিলাম। এল-এম-জি।"

"সে তো যত কন্‌ডেমড মাল আর্মির। অ্যাই দ্যাখ্, এইটা হচ্ছে ব্রিটিশ ব্রেনগান। ওরিজিনাল ডিজাইনটা চেকোস্লোভাকিয়ার ছিল। ব্রনোর নাম শুনেছিস তো। পয়েন্ট টু-টু রাইফেল দেখেছিলি না একটা, মনে আছে ? অ্যালবিনোর রহস্যভেদের সময় বিষেনদেওবাবুর কাছে, হাজারিবাগের মুলিমালোয়াতে ?"

"হুঁ !"

"ব্রেনগানকেন বলে তা বুঝলি ?"

"কেন ?"

"চেকোস্লোভাকিয়ার ব্রনোর ডিজাইনের উপর ইংল্যাণ্ডের এনফিল্ড মস্কো করে এই জিনিস তৈরি করেছে। তাই দুজনের নামই এতে জড়ানো আছে। ব্রনোর বি আর এবং এনফিল্ডের ই এন। বি· আর· ই· এন—ব্রেন। তাই ব্রেনগান।"

"আর ঐটা কী মেশিনগান ? কী সুন্দর ! এর তো স্ট্যাণ্ডেরও দরকার হয় না, না ?"

"না। এটা আমিও এর আগে দেখিনি। নাম শুনেছি, ছবি দেখেছি। এই টর্নাডো আর ভুষুণ্ডাদের দল যে কত সম্পদশালী আর ওয়েল-ইকুইপড ওয়েল-কানেকটেড তা এখানে না এলে বুঝতাম না। এইটা ইজরায়েলি লাইট মেশিনগান। নাইন মিলিমিটারের। অত্যন্ত পাওয়ারফুল। এক-একটা ম্যাগাজিনে পঁচিশটা গুলি নেয়। উনিশশো একান্ন সনে ইজরায়েলিরা অন্য দেশের উপর নির্ভরতা কমানোর জন্যে প্রথম এই উজি তৈরি করে। এই মেশিনগান এমনই কাজের যে, সারা পৃথিবীর মারদাঙ্গা-যুদ্ধবাজদের কাছে এর চাহিদা অসাধারণ। পশ্চিম জার্মানি, ওলন্দাজ এবং অনেক আফ্রিকান দেশের

আর্মি এখন এই উজি এল-এম-জিই ব্যবহার করে।"

বলেই বলল, "দেখে নে, কী করে ব্যবহার করতে হয়। দুটোই। তিতির ব্রেনগানটা চালাবে শুয়ে শুয়ে। তুই চালাবি উজিটা। আমাদের রাইফেলগুলো দিবি হেহে লোকগুলোকে, তিতিরের কম্যাণ্ডে।"

"আর তুমি ?"

"আমি একা যাব টর্নাডোর বেস ক্যাম্পে। এখন আর কোনো কথা নয়। তুই এক্ষুনি এই লোকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যা। তিতির এবং ওদের নিয়ে এখানে ফিরে আয়। এলেই সব বুঝিয়ে বলব। আর শোন্! আমার জিপটা চালিয়ে আনবি হেডলাইট না-জ্বেলে। তাতে জিনিসপত্র আছে জরুরি।"

বলেই সার্গেসন-এর জুতোর মধ্যে থেকে ম্যাপটা নিয়ে গুহার মধ্যে টর্চ জ্বেলে বসল।

আমি ফিরে না-গিয়ে রাক-স্যাক থেকে ওয়াকি-টকিটা বের করলাম।

ঋজুদা বিরক্ত হয়ে বলল, ম্যাপের দিকেই চোখ রেখে, "গেলি না তুই ?"

ঋজুদাকে গ্রাহ্য না করে ওয়াকি-টকিতে মুখ রেখে সুইচ অন করে বললাম, "হাল্লো।"

ওপাশ থেকে তিতিরের রিনরিনে গলা ভেসে এল, "টাঁড়বারো। টিটি।"

বললাম, "টাঁড়বারো—। রুফাস্।"

"গো অ্যাহেড।" তিতির বলল।

ঋজুদা বলে দিয়েছিল, টাঁড়বারো কোড ওয়ার্ড। তিতিরের কোড নেম টিটি। পাখির নাম। আমার কোড নেম রুফাস। রুফাস্, বাঁদরদের নাম। আমাকে এই কোড নেম দেবার পেছনে তিতির এবং ঋজুদারও গভীর চক্রান্ত ছিল বলেই বিশ্বাস আমার। ঋজুদার নিজের কোড নেম রিৎজ্, প্যারিসের রিৎজ্ হোটেলের নামে। ঋজুদা এও বলে দিয়েছিল যে, কথাবার্তা সব বাংলায় বলতে হবে।

তিতির আবার বলল, "গো অ্যাহেড, রুফাস্। গো অ্যাহেড। ঋজুদার জিপটা নিয়ে ওখানের অন্য সবাইকে নিয়ে এক্ষুনি এখানে চলে এসো। হেড-লাইট জ্বালাবে না। সোজা উত্তরে এসো আধ মাইল। তারপর, আমি টিলার উপরে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে থাকব। সেই আলো দেখে আসবে। সাবধান! ওয়াটহগ্‌দের গর্তে জিপ ফেলো না। এখন মোক্ষলাভের কাছাকাছি আমরা।"

"আসছি। কোনো খবর আছে ? নতুন ?"

"আছে। দারুণ খবর। এলেই জানবে।"

টিলার উপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ বোঝার উপায় রইল না যে, তিতির আদৌ রওয়ানা হয়েছে কিনা। মিনিট দশেক পর রানী মৌমাছির ডানার আওয়াজের মতো জিপের এঞ্জিনের গুনগুনানি ভেসে এল। আমি টর্চটা জ্বেলে, যাতে উল্টোদিক থেকে না দেখা যায় এমন করে টিলার নীচে আলো ফেলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখতে দেখতে তিতির এসে গেল। ভুষুণ্ডার ততক্ষণে জ্ঞান এসেছে।

আমি বললাম, "হ্যালো, ভুষুণ্ডা! চিনতে পারছ ?"

ভুষুণ্ডা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

তিতির তার মাথার দুর্গন্ধ কদমছাঁট চুল দুহাতে নেড়ে দিয়ে বলল,

"ওরে আমার বাঁদর নাচন
আদর গেলা কৌৎকারে,
অন্ধবনের গন্ধগোকুল,
ওরে আমার হৌৎকা রে।
ওরে আমার বাদলা রোদে
জষ্টি মাসের বিষ্টি রে
ওরে আমার হামান ছেঁচা
যষ্টিমধুর মিষ্টি রে।"

ঋজুদা বলল, "এখন ইয়ার্কি মারার সময় নয় তিতির। ভিতরে যা। রুদ্র, তুই

শিগগির ওকে ব্রেনগানটা চালানো শিখিয়ে দে। ততক্ষণে আমি জিপটাকে টিলার এ-পাশে এনে লুকিয়ে রাখছি। আপাতত।"

একটু পরে ঋজুদা যখন ফিরে এল, তখন আমরা প্রায় তৈরি। জিপ থেকে ঋজুদা একটা ব্যাগ নিয়ে এল। তার মধ্যে থাক-থাক তানজানিয়ান শিলিং-এর নতুন করকরে নোট।

"এই ব্যাগটা ওদের দিয়ে দে। বলে দে, এখন রেখে দিতে। ওদের কাছেই থাক। আমরা যে টর্নাডো বা ভুষুণ্ডার মতো খারাপ নই তা ওরা জানুক। ভোরবেলা সমানভাগে ভাগ করে নেবে। তার আগে যুদ্ধ করতে হবে ভাল করে ; যদি টর্নাডো যুদ্ধ করে। সামনাসামনি যুদ্ধ করার মতো বোকা সে নয়। তাকে তার ঘাঁটি থেকে বের করে আনতে হবে।" গম্ভীরমুখে ঋজুদা বলল, "এই সব খুনোখুনি আমাদের কাজ নয়। কিন্তু এবারে প্রথম থেকেই ব্যাপারটা এমনই দাঁড়াল যে, আমরা যেন প্যারা-মিলিটারি কম্যাণ্ডোজ সব। যুদ্ধ করবে তারা ; আমাদের কি এসব মানায় ? ভবিষ্যতে এরকম ঝামেলাতে যাব না আর।" ঋজুদা আমার হাতে ফ্লেয়ারগানটা দিয়ে বলল, "আমি জিপ নিয়ে চলে যাচ্ছি টর্নাডোর ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পের যত কাছে যেতে পারি, গিয়ে, তারপর হেঁটে যেতে হবে। জানি না, জিপ নিয়ে কত কাছে যেতে পারব।"

তিতির বলল, "তোমার সঙ্গে উজি এল-এম-জিটাও নিয়ে যাও ঋজুকাকা। একেবারেই একা যাচ্ছ !"

"না। বড্ড ভারী হয়ে যাবে। তাছাড়া আমার দুটো হাতই খালি থাকা চাই। টর্নাডো আর তার দলবলকে আমি এমন শিক্ষা দিতে চাই যে, সারা পৃথিবীর পোচাররা যেন জানে যে, যত বড় বলবান আর অর্থশালীই তারা হোক না কেন, তাদের সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার

লোকও আছে। শোন্ রুদ্র। ঘড়িতে যখন ঠিক তিনটে বাজবে, তখন এই ফ্লেয়ারগানটা থেকে আকাশে ফ্লেয়ার ছুঁড়বি। সিগন্যালটা মনে আছে তো ?"

"আমাদের সিগন্যাল ?"

"আঃ। আমাদের কেন ? ডবসনের সিগন্যাল। ডবসনের ডিস্ট্রেস সিগন্যাল দিয়ে আমরা টর্নাডোকে এই টিলার কাছে নিয়ে আসব। এবং টর্নাডো যখন তার আস্তানা ছেড়ে তোদের এদিকে আসবে, তখন সেই আস্তানাকেই আমি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব ডিনামাইট দিয়ে। আর তোরা ঐ ব্রেন-গান আর উজি আর তিতিরের হেহে চ্যালারা আমাদের রাইফেল দিয়ে ওদের কচুকাটা করে দিবি। বুঝেছিস ? এবার বল দেখি সিগন্যালটা কী !"

"ওয়ান গ্রিন, ফলোড বাই টু রেড দেন টু বি কনক্লুডেড বাই ওয়ান গ্রিন।" তিতির মুখস্থ করল।

ঋজুদা বলল, "ফাইন। তাহলে আমি এগোচ্ছি।" বলে বুড়ো আঙুল তুলে থাম্বস-আপ করল।

আমরাও থাম্বস-আপ করলাম।

তখন বাজে প্রায় সোয়া একটা। ঋজুদার জিপের এঞ্জিনের গুড়গুড়ানির আওয়াজ মিলিয়ে গেল বন-পাহাড়ে। এমন সময় ভুষুণ্ডা বলল, "ওয়াটার!"

আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে তিতিরকে বললাম, "তোমার একজন চ্যালাকে বলো তো ওর মুখে এটা পাকিয়ে পুরে দেবে।"

"তুমি কী নিষ্ঠুর!" তিতির বলল। "জল দেব? আমার ওয়াটার বট্‌লে আছে।"

"আমারও আছে। কিন্তু দেব না। দয়ামায়া আমারও কম নেই তিতির। কিন্তু আমি এবং ঋজুদা যে গুগুনোগুম্বারের দেশ থেকে বেঁচে এসেছি, তা ভগবানের অশেষ দয়াতে। এ যে ব্যবহারের যোগ্য সেই রকম ব্যবহারই এর সঙ্গে আমাকে করতে দাও। আমার মধ্যে দয়া যেমন আছে, নিষ্ঠুরতাও আছে। এতখানি যে আছে, তা মাঝে মাঝে আমি নিজেই বিশ্বাস করি না। আমার সঙ্গে যারা শত্রুতা করবে বা করেছে তারাই জানবে অথবা জেনেছে সেই নিষ্ঠুরতার রূপ। সংসারে যে যেমন ব্যবহারের যোগ্য, তাকে ঠিক তেমন ব্যবহারই দেওয়া উচিত। আমি আমার বাবাকে দেখে শিখেছি তিতির। ভালমানুষকে এখানে সবাই বোকামানুষ ভাবে। বাবাকে কে না ঠকিয়েছে! কে বা দুর্ব্যবহার না করেছে তাঁর সঙ্গে। ভালর সঙ্গে আমি ভাল হব, আর খারাপের সঙ্গে খারাপ। ও আমার চোখের সামনে যদি 'জল জল' করে মরেও যায়, একফোঁটা জলও দেব না ওকে। মরুক।"

তিতির বলল, "যাকগে। মরুকগে ও। আচ্ছা, কচুকাটার ঠিক ইংরিজি কী, জানো? ঋজুকাকা কচুকাটা করে দিতে বলে চলে গেল। এরকম অর্ডারের কথা তো কখনও শুনিনি।"

"কচুকাটার আবার ইংরিজি কী? সাহেবদের দেশে কি কচু হয়? কচু পুরোপুরি স্বদেশী জিনিস। ওরা বলে, মো-ডাউন; ঘাস-কাটার জাত তো। আর আমরা বলি, কচুকাটা। কেমন জবরদস্ত কথাটা, বলো?"

"তা ঠিক!"

এদিকে তিতিরের হেহে চ্যালারা টাকার গন্ধ শুঁকে রীতিমত নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার উপর মৃতসঞ্জীবনীর প্রভাব এখনও বোধহয় আছে। লোকগুলো একটু বেশি পরিমাণ সঞ্জীবিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কড়া ওষুধের এই দোষ। ডোজের গণ্ডগোল হলেই গলগণ্ড! যে-বুড়োটা মরল গাছের মগডালে ব্রহ্মদৈত্যের মতো বসে বসে, সে যে বিশেষ-বেশি সঞ্জীবিত হয়েছিলই তাতে কোনোই সন্দেহ নেই আমার। নইলে, দড়ি ধরে তোয়ালে নাড়তে পারল মগডালে বসে, আর তীর ছুঁড়তে পারল না একটা! বেচ্চারা! ঋজুদা তো ঐ বুড়োটাকে কিছুই দেয়নি। নিশ্চয়ই ওর বৌ-ছেলেদের দেবে কিছু। সব ভালয়-ভালয় মিটুক। ভুষুণ্ডা যে আমাদেরই হেপাজতে এ-কথাটা এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আড়াইটে এখন ঘড়িতে। আমাদের টেনসন বাড়তে লাগল। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু ঋজুদা যেদিকে গেছে সেদিক থেকে হাতির বৃংহণ আর আমাদের বাওবাব গাছের দিক থেকে হায়েনার বুক-কাঁপানো অট্টহাসি ভেসে আসছে।

তিনটে বাজতে দশ। পাঁচ। তিন।

"হিন্দিতে কাউন্ট-ডাউনকে কী বলে

বলো তো ?"

তিতির আমাকে শুধোল, আড়াই মিনিটের মাথায়।

রাগ ধরে গেল আমার। ফ্লেয়ারগানটা নিয়ে, শেলগুলো ঐ অর্ডারে সাজিয়ে গুহার বাইরে এলাম আমি। উত্তর দিলাম না। ফাকসা-আলাপের আর সময় পেল না!

তিতির উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল, নিজের মনে, "উলটি-গীনতি।"

ফ্লেয়ারগানটা হাতে করে দাঁড়ালাম আমি। আর ষাট সেকেণ্ড। উনষাট, আটান্ন, সাতান্ন....চলতে লাগল উলটি-গীনতি।

টেনসন একেকজনের মধ্যে এক-একরকম কাজ করে। কেউ স্থির হয়ে যায়, কেউ অস্থির, কেউ আবার ঘুমিয়েও পড়ে। তিতির বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল।

সবুজ আলোয় ভরে গেল আকাশ। তারপর লালে, তারপর আবার সবুজে। ফ্লেয়ারগান ছুঁড়েই আমি এসে জায়গা নিলাম। তারপর তিতিরকে বললাম, "তুমি আর আমি একই জায়গায় থাকলে আমাদের ফায়ারিং-পাওয়ার কার্যকরী হবে না। তুমি এখানে থাকো। আমি টিলার উপরে পাথরের আড়ালে গিয়ে থাকছি। তোমার কাছে একজন হেহেকে রাখো রাইফেল হাতে। আমি অন্যজনকে নিয়ে যাচ্ছি। টিলার উপরে থাকলে চারদিক দেখাও যাবে। টর্নাডোর দল, ঋজুদা যে পথে গেছে ; সেই পথ দিয়েই আসবে তার কী মানে ?"

"ঠিকই বলেছ। তাই-ই যাও।" তিতির বলল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "বেস্ট অব লাক্। গুড হান্টিং।"

একটু থেমে বলল, "আমি তোমার সঙ্গে সব সময় ঝগড়া করি, তোমার পেছনে লাগি বলে তুমি রাগ করো না তো রুদ্র ? আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

আমি ওর হাতে চাপ দিয়ে, হাতটা ছেড়ে দিয়ে জ্যাঠামশায়ের মতো গলায় বললাম, "এ সব মেয়েলি কথাবার্তা, ঢং-ঢাং পরে হবে। এখন এসবের সময় নেই। সাবধানে থেকো। লুক আফটার ইওরসেলফ্!"

"সো ড় উা!" বলল তিতির।

অন্ধকার কি কেটে যাচ্ছে ? নাঃ। দেরি আছে অনেক এখনও ভোর হতে। সব প্রতীক্ষার রাত, সবচেয়ে দীর্ঘতম রাতও ভোর হয় এক সময়। আমাদের এই রাতও আশা করি ভোর হবে। আবার পাখি ডাকবে। আমাদের গায়ে রোদের চিকন বালাপোশ এসে আলতো করে জড়িয়ে নেবে নিজেকে।

বেশ শীত এখন। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে। কী করে যে এতক্ষণ সময় কেটে গেল! আশ্চর্য! হঠাৎ, সামনের প্রায় - নিস্তব্ধ প্রায়ান্ধকার রাতের বুক চিরে দু' জোড়া হেডলাইটের আলো ফুটে উঠল। এবং আস্তে আস্তে আলো যেমনই জোর হতে লাগল, তেমনই জিপের এঞ্জিনের আওয়াজও জোর হতে লাগল। কাছে আসতেই বুঝলাম, জিপ নয়, ল্যাণ্ডরোভার। তখনও গাড়িগুলো টিলা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে আছে, ঠিক সেই সময়ই মনে হল পৃথিবী বুঝি ধ্বংস হয়ে গেল। নাকি কোনো আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হল ? অনেক দূরে, আকাশ লালে-লাল হয়ে উঠল। পেট্রলের ড্রাম ফাটার আওয়াজ আর লকলকে আগুনের শিখা লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগল আকাশে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ল্যাণ্ডরোভার দুটো আমাদের দিকে আর না এসে, মুখ ঘুরিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই তীব্রগতিতে ফিরে চলল, অন্ধকার জঙ্গলে আলোর চাবুক মেরে মেরে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : অনুপ রায়

আপনার আদরের মেয়েটিকে
দিন উপহার, ক্যালামাইন-এর দীপ্তিময় রূপের বাহার!
এই বাড়ন্ত বয়েস, আর এই ফোটাফুলের মত তরুণ মুখশ্রী—তার জন্যে দরকার—একটু বিশেষ ধরনের যত্নের ছোঁয়ার। পণ্ডস্ ক্যালামাইন—আজকের মেয়েদের জন্যেই। এর শীতল আরামদায়ক পরশ ওদের মুখশ্রীকে ফুলের মত তাজা আর সৌন্দর্যের দীপ্তিতে ভরিয়ে রাখে। এ হ'ল এমন এক সৌন্দর্য প্রসাধন, যা দিয়ে প্রতি মা-ই চান ওঁদের মেয়েদের সৌন্দর্যে চমক আনতে
পণ্ডস্
ক্যালামাইন
মেয়েদের প্রথম প্রসাধন
POND'S
Calamine
Lotion
LINTAS(M) PIL-PCL-7-1610-BG

(এর পরে নতুন অ্যাডভেঞ্চার)

রোভার্সের রয়
লিগের প্রথম খেলা কারফোর্ড সিটির বিরুদ্ধে। রয়কে একেবারে ঢেলে সাজাতে হয়েছে রোভার্স দলকে।
প্যাকোও পিছলে পড়ল।
কারফোর্ড উঠে আসছে
ব্যাক পাস করে চার্লিকে দাও।
গাইলস শুনতে পেল না-
যাঃ!
আছাড় খেয়েছে
সর্বনাশ
কারফোর্ড গোল দেবে!
শাবাশ!
শাবাশ চার্লি!
কর্নার
যা বলছি করো। তুমি বেশি লম্বা, তাছাড়া হেডও তোমার ভাল।
ঠিক আছে
ব্ল্যাকি হেড করল।
বল মার্টিনের কাছে।
বল বাড়াও মার্টিন।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কেটে গেল। শিব্বা যেন
কারো গোলাম না হয়।
কিন্তু সুলতান যদি তোমাকে কোতল করে?
করবে? শাহজি ভোঁসলেকে কোতল করা অত সহজ নয়।
এখনও পাঁচ হাজার সৈন্য আমার রুটি খায়। কিন্তু সে যাক। শিব্বাকে বলিস আমার কথা যেন না ভাবে। আমি নিজের ভাবনা নিজে ভাবব। তবে শিব্বা যেন আমাকে একেবারে ভুলে না যায়।
সদাশিব তখন শাহজিকে প্রণাম করে বলে...
আমি তাহলে এবার যাই তোমার সব কথা শিব্বা রাজাকে বলব।
কী ছেলেরে তুই! এতটুকু ছেলের এত বুদ্ধি, এত সাহস! একলা এই শত্রুপুরীতে এসেছিস!

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাশ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কে বড়?

(আফ্রিকার উপকথা)

আরতি দাস

এখন যেমন আমরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াই, সেই রকম অ-নে-ক দিন আগে গাছরাও একসঙ্গে ঘুরে বেড়াত। একত্রে খেতে বসে মানুষদের মতো গল্প-গুজব, তর্কাতর্কি করত। নিজেকে বড় ভেবে কেউ কেউ অপরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। গাছপালার মধ্যেও সেই ধরনের মনোভাব ছিল।

একবার এক জঙ্গলের মাঝখানে ছোট-বড়-মাঝারি মাপের গাছগাছালি খেতে বসেছে পাশাপাশি। একটি মেয়ে রঙিন জামাকাপড় পরে পরিবেশন করছে ওদের। মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দর। তালগাছের মাথা এমনিতেই খুব উঁচু। তার ওপর ওইরকম রূপসী একটি মেয়েকে দেখে তার মাথা আরও উঁচু হয়ে গেল। খাওয়া ফেলে রেখে সবাইকে ডেকে তালগাছ বলল, 'গাছগাছালির রাজত্বে আমার চেয়ে বড় আর কে আছে? পাকা তাল দেখতে বেশ বড়, আবার তার স্বাদও দারুণ। শুধুই কি ফল? আমার গাছ থেকে রসও তৈরি হয়। তালপাতার পাখার হাওয়া খেয়ে সবাই কত আরাম পায়! তালআঁটির শুকনো শাঁস পিষে যে তেল বার হয়, সেই তেলেই তো এই সব রকমারি খাবার রান্না করা হয়েছে। এখন তোমরা বলো, অন্য কোনো গাছের এত গুণ আছে?"

দুপুরবেলা। খিদেয় পেট চৌ-চৌ করছে সবার। ডালপালা ঝুঁকিয়ে মুখ নিচু সব গাছরা খাচ্ছে। তালগাছের কথায় কারও তেমন মন নেই। এক কাপাসগাছ এতক্ষণ তালগাছের ঠিক মুখোমুখি বসে গপাগপ্ করে খাচ্ছিল। তালগাছের শেষের কথাগুলো কানে যেতেই তার মেজাজ বিগড়ে গেল। মুখ তুলে নিচু গলায় কাপাস বলল, "ওহে তালেশ্বর, খেতে বসেছ, চুপচাপ খেয়ে যাও। অত দেমাক কিসের? সবার সব দোষ গুণ জেনে বসে আছ না কি তুমি?"

এক চুমুক জল খেয়ে কাপাস আবার বলল, "আমি সামান্য গাছ, তবু আমারও কিছু গুণ আছে। আমার গাছের তুলো

থেকে বালিশ তোশক ইত্যাদি তৈরি হয়। আমার সুতো দিয়েই তো কাপড় বানানো হয়। এবার ভাবো, আমাকাপড় না থাকলে মানুষ গা ঢাকত কী দিয়ে ?"

এই কথায় তালগাছ খুব চটে গেল। কী এত বড় কথা ? ভোজসভায় সবার সামনে অপমান ! প্রচণ্ড রাগে বিশাল পাতাওয়ালা মস্ত মাথা দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল তালগাছ। "খবদার কাপাস ! আমার মুখের ওপর কথা বলবি না কক্ষনো। ওই তো পাঁকাটির মতো সরু-সরু ডাল, তোর ডাল একটা বাচ্চা ছেলেও ভাঙতে পারে। তোর আবার এত হম্বিতম্বি ! একেই বলে ছোট মুখে বড় কথা !"

এই কথায় কাপাসের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। সে চুপচাপ খাওয়া শেষ করে মাতব্বর সব গাছকে ডেকে বলল, 'এতক্ষণ আমাদের দুজনের কথাই শুনেছেন আপনারা। আপনারা বয়সে বড়। বিচার করে বলুন, আমাদের দুজনের মধ্যে কার গুণ বেশি ? কে বড় ?"

তখন সুপুরি গাছের মাথা থেকে সুপুরি নিয়ে মুখে ফেলে প্রবীণ গাছরা বসল সভায়। অনেক ভেবেচিন্তে তারা বলল : তালগাছ থেকে ফল, রস, তেল, পাখা ইত্যাদি অনেক কিছু পাওয়া যায়, এ কথা সত্যি। তবে কাপাস-তুলোর পক্ষেও অনেক কথা বলবার আছে। না খেয়ে মানুষ বাঁচে না। ঘরে খাবার না থাকলে ভিক্ষে করে খেতে হয় মানুষকে। কিন্তু পরনের কাপড় না থাকলে সে ভিক্ষেয় বেরুবে কী করে ? এইসব কথার শেষে গাছেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে রায় দিল : জামা-কাপড়ে গা ঢেকে বাইরে যেতে পারে মানুষ। পোশাক না থাকলে মানুষ আর পশুতে কী তফাত ? সুতরাং গুণের বিচারে তালগাছের চেয়ে কাপাসগাছ অনেক বড়।

ছবি : অতুল রায়

গুহাটা কোথায় শেষ হয়েছে, দেখা যাক !
বাব্বা, এ যে শেষই হতে চায় না !
চলছি তো চলছিই !
স্ট্যালাগমাইট আর স্ট্যালাকটাইট ! অর্থাৎ চাঁদে একসময় জল ছিল !
এগিয়ে যাসনে কুট্টস !
কেন, অত ভয় কিসের ?
ভৌঔঔ !
!
ফাটল ! কুট্টস পড়ে গেছে !
ঠিক আছে !
ঠিক নেই !
হুশিয়ার ! অক্সিজেনের নল ফাটলেই সর্বনাশ !
জানি !
যাক, দাঁড়ানো গেল ! কুট্টস ! কুট্টস !
কুট্টস নিশ্চয় মারা পড়েছে ! ফিরে এসো টিনটিন !
না-দেখে ফিরব না !
ফাটল ক্রমেই চওড়া হচ্ছে !
দড়ি শেষ ! আর এগোবার উপায় নেই !

একটা বিপদ তো কাটল, কিন্তু
চাঁদের এই মৃত্যুপুরীতে আরও
অসংখ্য বিপদ ওদের জন্য
অপেক্ষা করছে

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কাজের খোঁজে

মানস রায়

স্কুলে তাঁর ঘরে চেয়ার ছেড়ে উঠব-উঠব করছেন ভবতারণবাবু, ভবতারণ চৌধুরী। শেষ পিরিয়ডের ঘন্টা পড়ে গেছে। ছেলেরা হৈ-চৈ করতে-করতে স্কুল ছেড়েছে। ঝিম মেরে গেছে স্কুলটা। সকালটাও অনেকটা বুড়িয়ে গেছে যেন। একটু পরে এগারোটা বাজলে মাধ্যমিক সেকশনের ক্লাস শুরু হবে। আবার হাঁকডাক, হৈ-চৈ। সেই চারটে সাড়ে-চারটে পর্যন্ত।

দরজা ঠেলে বছর-দশেকের একটি ছেলে ঢুকল। ময়লা রঙ, চোখ বসা, গাল ভাঙা। পিঠে কুঁজ। পরনে হাফ-প্যান্ট, গায়ে চেক-চেক শার্ট। সেটি ছেঁড়া, কলার ফাটা। টিপ্ করে প্রণাম করল ছেলেটি। ছাত্রছাত্রীদের প্রণাম নেওয়ার অভ্যেস আছে ভবতারণবাবুর। অবাক হলেন না। শুধু সস্নেহে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছেলেটির মুখটা বড় মায়াময়। পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল স্কুলের দরোয়ান বঙ্কিম। বললে, "এর নাম গোবিন্দ, গোবিন্দ গিরি। আমাদের পাশের গাঁয়ে থাকে। আপনি বলেছিলেন কাজের লোক দরকার— !"

ভবতারণবাবু উমেশচন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক। সকালে বাড়ি থেকে বেরতে হয়। দুপুরে মুখে দু-মুঠো গুঁজে প্রেসে। তাঁর নিজের ছাপাখানা আছে। সারা দুপুরটা সেখানেই কাটে। ভবতারণবাবুর স্ত্রীও বেরোন। তিনি একটি সরকারি অফিসে চাকরি করেন। ছেলেপুলে নেই। সারাদিন বাড়ি খালি পড়ে থাকে। ভবতারণবাবুর খাওয়া-দাওয়া ঠিক-ঠিক হয় না। বঙ্কিম এতদিন ভবতারণবাবুর কাছে ছিল। স্কুলে চাকরি পাবার পরে ভবতারণবাবুকে ছেড়েছে। সেই থেকে খুব অসুবিধের মধ্যে আছেন তিনি। গোবিন্দকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলেন ভবতারণবাবু।

গ্রাম থেকে আসা এইসব গোবিন্দরা এখন ভবতারণবাবুদের মতো শহরের অনেকের অঙ্কের যষ্টি। এরা বাবুদের বাড়ি পাহারা দেয়, হাটবাজার করে, ফাইফরমাস খাটে, দরকার হলে রান্নাও করে। বিনিময়ে থাকা, খাওয়া, পরা এবং কিছু টাকা। কাজের ছেলেদের অবশ্য নিজেদের মতো দেখে অনেকে। ভবতারণবাবুই যেমন। কিন্তু সে সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ ছেলেমেয়েই অবহেলায় অযত্নে দিন কাটায়।

এই অবহেলা, অযত্ন চরমে ওঠে দোকানে, কলকারখানায় এবং মোটর-গ্যারাজে। সবাই তো আর বাবুদের বাড়ি কাজ পায় না, পেলেও ভবতারণবাবুর মতো সব বাবু নন। ফলে, বাবুর বাড়ি ছাড়তে হয়। দুর্গতিটা শুরু হয় তখন থেকে। খাওয়ার ঠিক নেই। মালিক খেতে দেয় না নিয়মিত, দিলেও সে খাদ্যে গায়ে গত্তি লাগার কোনো উপাদানই থাকে না। নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সেখানেই ঘুম, তাও শিশুবয়সে ক্ষয়পূরণের উপযোগী পর্যাপ্ত ঘুম নয়—চোখের পাতা এক করা শুধু। এর ওপর আছে বয়স্কদের সান্নিধ্য। তাদের ভাবনাচিন্তা, কথাবার্তা, খেয়ালখুশিতে অংশ নেওয়া। অচিরেই শিশুমনে বয়স্ক ছাপ পড়ে যায়। দরকচা মেরে যায়।

তোমরা হয়তো বলবে এইসব ছেলেদের কি ঘরবাড়ি নেই, বাবা-মা নেই। বাবা-মা এদের বাচ্চা বয়সেই ঘরের বাইরে বের করে দেয় কেন? এরা কি বাড়িতে থাকলে বাবা-মাকে খুব জ্বালায়? না, ব্যাপারটা সে-রকম নয়। কয়েকদিন ধরে বেশ কিছু এ-ধরনের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, এরা নিরুপায় হয়ে ছেলেবেলায় বাবা, মা, ভাই-বোনকে ছেড়ে কাজের

সন্ধানে বেরোয়। কোনো বাবা- মা কি তার বাচ্চাকে চোখ-ছাড়া করে? কী করবে বলো, এদের বাবা-মায়ের সে রোজগার নেই যে ছেলেমেয়েদের দু-বেলা খেতে দেবে। বাবা-মায়ের কেউ-কেউ খেতখামারে কাজ করে, কেউ ফরামির, কেউ দিনমজুর। এতে সাকুল্যে মাসে দেড়শো-দুশো টাকা হয় কি না সন্দেহ। নিজেদের পেট, পাঁচ-ছটা ছেলেমেয়ের পেট—ওতে কুলিয়ে ওঠে না। বাধ্য হয়ে তখন বাবারা গ্রামের পরিচিত লোক খুঁজতে থাকে যার শহরে যাতায়াত আছে। কাজের খবর পেলে এদের বাবা-মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। অন্তত একটা ছেলে কিংবা মেয়েরও তো ভাত-কাপড়ের দুশ্চিন্তা ঘুচল। এরা তখন সেই পরিচিতের হাত ধরে বাস-ট্রেন-নৌকো ঠেঙিয়ে শহরে পাড়ি দেয়।

মেদিনীপুরের অদ্বৈত, নিতাই; সোনারপুরের কল্পনা, মীনা, কল্টু; লক্ষ্মীকান্তপুরের পরমেশ, ভোলা, স্বপ্না—এরা সবাই কেউ এক বছর, কেউ দুই, তিন বা পাঁচ বছর বাবা-মাকে ছেড়ে চলে এসেছে কলকাতায়। কাজ করছে হয় বাবুদের বাড়ি, নয়তো ছোটখাট কারখানায়, মুদির বা মিষ্টির দোকানে কিংবা মোটর-গ্যারাজে। মাইনে দশ থেকে ষাট সত্তর টাকা—কাজের রকমফের আর বাবু ও মালিকের মর্জি অনুযায়ী। মাইনের টাকার কিছুটা খরচ হয়, বাদবাকি যায় দেশে। এদের অধিকাংশ পড়াশুনার প-ও জানে না। ফলে, দেশে মনিঅর্ডার করে কত টাকা পাঠাবার সময় অনেক বাবু কম লিখে বেশি টাকা নিয়ে ঠকিয়ে দেয় এদের। বয়স কম বলে ধমকেধামকে বেশি খাটিয়েও নেয় বাবুরা। অধিকাংশ বাবুই খাওয়াপরা নিয়ে দুর্ব্যবহার করে।

তবু এরা দলে দলে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে। বেশিরভাগই আসে

অন্যের বাড়িতে দাসীবৃত্তি

মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামগুলি থেকে। প্রতি দশ বছরে প্রায় হাজার-আটেক খুদেরা রুটির জন্য কলকাতায় ভিড় করে। বাড়তে বাড়তে এদের সংখ্যা এখন প্রায় লাখের কাছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ছেলে। মেয়ে কম। শতকরা সত্তরভাগ বাবুদের বাড়িতে রাতদিনের কাজ করে। বাকি কারখানায়, দোকানে এবং মোটর-গ্যারাজে। মেয়েরা বাবুদের বাড়িতে রাতদিনের কাজ করতে পছন্দ করে। ছেলেরা কারখানায়, হোটেল-রেস্টুরেন্টে ও মোটর গ্যারাজে। এখানে পয়সা বেশি। কিন্তু গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে সরাসরি এসব কাজ আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতো। তাই প্রথম-প্রথম প্রায় সবাইকেই বাবুদের

গড়চায় পানের দোকানে কাজ করে গণেশ

চায়ের দোকানে কাজ করে এই শিশু-শ্রমিক

গ্যারাজে কাজ করে বারো বছরের মুন্না

বাড়িতে কাজের হাতেখড়ি নিতে হয়। বঙ্কিমের কথা আগেই বলেছি, ভবতারণবাবুর বাড়িতে আগে কাজ করত, এখন স্কুলের দরোয়ান হয়েছে। হাবড়ার বিষ্ণু সিঁথির এক বাবুর বাড়িতে প্রথমে এসে উঠেছিল। এখন শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কের কাছে এক মোটর-গ্যারাজে কাজ পেয়েছে। মেদিনীপুরের নিতাইও পাইকপাড়ার বাবুর বাড়িতে বছর-পাঁচেক কাজ করার পর এখন বি টি রোডে পালপাড়ার এক স্টিলের বাসনের দোকানে কাজ করে।

শিশু ও শিশুদের কাজে ব্যবহার করা নিয়ে যাতে কেউ অন্যায় সুযোগ নিতে না পারে তার জন্য অনেক আইন আছে আমাদের দেশে। যেমন পনেরো বছরের কম-বয়সীদের কাজে নিতে পারবে না। খাটাতে পারবে না আট ঘন্টার বেশি। মাইনে দিতে হবে কমপক্ষে আড়াইশো টাকা। দুঃখের কথা, বাবু বা মালিকরা কেউই এই আইন মানেন না। অভাবের সুযোগ নিয়ে তাঁদের অধিকাংশই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলিকে খাটিয়ে নেন বিস্তর। আইন খাতায়-কলমে পড়ে থাকে। ধুলো খায়।

ভেবে দেখো, তোমাদের মতো ছোট যারা, দেশের ভবিষ্যৎ সুন্দর ভারত গড়ে তুলবে, তাদের এক বড় অংশই আজ অভাবের শিকার। পেটের জ্বালায় এরা ধ্বংসের দিকে চলেছে। এই ধ্বংসলীলা ঠেকাতে না পারলে এখন না হোক সামনের কোনো একদিন বড় দুঃসময় আসছে দেশের। তখন মাথা খুঁড়লেও দেশকে আর বিশ্বের পাতে ফেলা যাবে না।

উপন্যাস

ভুতুড়ে দুপুর

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর, বাড়ির সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে কেউ বা বিছানায়, কেউ বা মেঝেয় মাদুর পেতে টানটান হয়ে ঘুমোচ্ছে। এরকম একলা-সময়ে খিড়কি-দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সন্টু। বাড়ির পিছনে বিশাল বাগান। আম, জাম, কাঁঠাল থেকে শুরু করে বঁইচি, ফলসা, করমচা পর্যন্ত সবরকম ফলের গাছে ভর্তি ওদের এগারো বিঘের বাগানটা, তার মধ্যে শানবাঁধানো চৌবাচ্চা পুকুর, চারপাশে সার দিয়ে নারকেল আর তালগাছ। বাগানে ঢুকে সন্টু চলে এল পুকুরপাড়ে, কাছাকাছি একটা লম্বা তালগাছে গায়ে গা লাগিয়ে বিশাল একটা রেন-ট্রি, তার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে জম্পেশ করে বসল।

তার হাতে একখানা ভূতের গল্পের বই। ভূতের গল্প ওর খুব ফেভারিট, সাধারণত রাত্তির ছাড়া ও ভূতের গল্প পড়ে না। যে-গল্পের যেরকম পরিবেশ, সেটাই ওর পছন্দ। এখন দুপুরে তাদের বাগানের এই গা-ছমছমে পরিবেশেও ভূতের গল্প বেশ জমে উঠবে। এমনিতে ভূতকে খুব একটা কেয়ার করে না সে, বরং পোড়োবাড়ি দেখলেই রাতের অন্ধকারে উঁকিঝুঁকি দেবার লোভ ওকে মাঝে-মাঝে পেয়ে বসে, কিন্তু হয়ে ওঠেনি কখনও। কিল্টুদা এ-ব্যাপারে ওর জুড়ি, তার সঙ্গে রাতে তিনতলার ছাদে উঠে গাছগাছড়ার দিকে তাকিয়ে থেকেছে, হঠাৎ যদি কোনো ভূতবাবাজির রকমসকম ওদের নজরে পড়ে, কিন্তু কিছুতেই কিছু ঘটেনি।

গল্পটা পড়া শুরু করতেই পুকুরপাড় থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে এল একঝলক, শরীরটা জুড়িয়ে এল সন্টুর। গল্পটা পাড়াগাঁর। ভূত তো পাড়াগাঁয়েই বেশি থাকে, শ্যাওড়াগাছের ডালে, কিংবা চাঁপাগাছের পাতায়, কিংবা জোড়া অশত্থগাছের মগডালে বসে ওদের যত কাণ্ডকারখানা। কিন্তু এ গল্পটায় একটা

সূর্য্যের রশ্মি যখন অনবরত আপনার ত্বকের রঙ ময়লা করতে থাকে, আপনি কি ফর্সা হতে পারেন ?

LINTAS FALOV-33 1956 BG

আপনি জন্মেছিলেন এক বিশেষ রঙ নিয়ে। কিন্তু আজ তা অনেক পর্দা ময়লা হয়ে গেছে। আপনি জানেন—সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি কত চট্ করে রঙ ময়লা করে দিতে পারে। কিন্তু ওটাই রঙ ময়লা হওয়ার একমাত্র কারণ নয়! আপনার ত্বকের ভেতরে মেলানিন নামে এক রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু ত্বকে অন্যের তুলনায় অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়ে—আর, যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, ত্বক তত বেশী কালো দেখায়।

রঙ ফর্সা করার কি নতুন কোনো উপায় আছে?

হাঁ, আছে! এই প্রথম, বিজ্ঞানের এক নতুন আবিষ্কার—রঙ কালো করার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ তো করেই, এমনকি তা বিপরীত দিকে চালনাও ক'রে। এ হল রঙ ফর্সা করার ক্রীম: ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী কিভাবে কাজ করে?

ত্বকের ভেতরে: ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী, রঙ কালো করার প্রণালীকে বিপরীত দিকে চালনা ক'রে, ত্বকের ভেতরে ব্লিচ-কোমল আর নিরাপদভাবে কাজ ক'রে আপনাকে এমন ফর্সা ক'রে যা নজরে পড়ে।

ত্বকের বাইরে: ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী-র বিশেষ 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা', আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে আটকে রঙ ময়লা হওয়া নিবারণ করে, অথচ আপনি সূর্যের যাবতীয় স্বাস্থ্যকর গুণ গ্রহণ করতে পারেন।

ফর্সা হবার জন্যে মাত্র ৬-সপ্তাহের কোর্স:

৬-সপ্তাহ নিয়মিত দিনে দুবার ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী মাখুন। প্রথমবার মাখার পর ত্বক হয়তো একটু চিন্‌চিন্ করতে পারে। এর মানে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী কাজ করছে। ৬-সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সবার নজরে পড়বেই। নিয়মিত ব্যবহার করুন—আর ফর্সা হয়ে থাকুন।

ফর্সা হওয়া বা ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে হলে, এর কাছে লিখুন:

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী অ্যাডভাইজার,
পোঃ অঃ বক্স নং ৭৫৮, বম্বে-৪০০ ০২১।

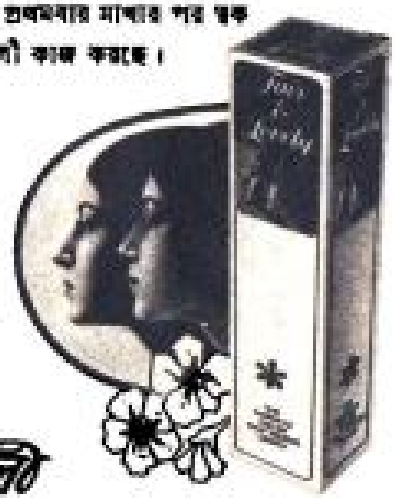

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী

রঙ ফর্সা করার ক্রীম

হিন্দুস্থান লিভারের
উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আপনাকে নজরে পড়ার মত ফর্সা করে··· প্রকৃতির নিজস্ব কোমল উপায়ে!

অন্যরকম ভূতের কথা পড়ে চমকে উঠল সে। গোরু মরে গেলেও যে ভূত হয়, তা কখনও শোনেনি। অবশ্য সব গোরুই যে ভূত হয়, তা নয়। যে-সব গোরু অপঘাতে মরে তারাই পরে গো-ভাগা বা গো-ভূত হয়ে যায়।

তো, এরকম একটা গো-ভাগার পাল্লায় পড়ল পাড়াগাঁর একটা লোক। যাচ্ছিল মেঠোপথ বেয়ে হনহন করে, দুপাশে ধানের খেত, মাঝখান দিয়ে বড়-বড় ঘাস মাড়িয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা ইঁদুর দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। ইঁদুরটার গলায় একটা ঘন্টা বাঁধা, শব্দ হচ্ছে ঝুনঝুন। শুধু তাই নয়, তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। লোকটা বুঝতে পারল, এটা নিশ্চয় গো-ভাগা। আর বুঝতে পেরেই তার বুকের ভেতর রেলগাড়ি চলতে থাকল। গো-ভাগারা তো মাঠে-ঘাটেই ঘুরে বেড়ায় ইঁদুরের রূপ ধরে, আর এই ইঁদুর যদি কোনোরকমে একবার কোনো পথিকের দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে পারে, তাহলে মুখে রক্ত উঠে সে পথিকের মৃত্যু অনিবার্য।

লোকটা অসহায় হয়ে চারপাশে চাইল। ইঁদুরটা সামনে দিয়ে এলে তবু দু-পা জোড় করে তাকে ঠেকানো যেতে পারে। ইঁদুরটা কিন্তু সামনে দিয়ে এল না, ঝুনঝুন শব্দ করে পাশের ধানখেতে ঢুকে গেল। তখন লোকটা জোর কদমে হাঁটা শুরু করল, কিন্তু তাতেও রেহাই নেই, আবার ইঁদুরটার ঝুনঝুন শব্দ শোনা যায়। কাছেপিঠে কোথাও আছে, হয়তো বা অদৃশ্য হয়ে। একবার দুপায়ের ফাঁক দিয়ে গললে—

ভয়ে লোকটা দৌড় শুরু করে, মেঠোপথ ভেঙে দৌড়তে-দৌড়তে যখন সে হাঁপিয়ে পড়েছে, ঠিক সে-সময় পিছনে আবার ঝুনঝুন শব্দ। পিছন ফিরে দ্যাখে, ইঁদুরটা বেশ বড়সড় মনে হচ্ছে এবার, আর তার চোখদুটো যেন একটা গোরুর চোখের মতো জ্বলছে। বুঝতে পারল গো-ভাগাটা তার পিছু নিয়েছে, তাহলে আজ আর নিস্তার নেই। ভয়ে এবার সে ইঁদুরটাকে সামনে রেখে পিছনদিকে হাঁটতে শুরু করে। তক্ষুনি ইঁদুরটা অদৃশ্য হয়ে আবার তার পিছনে চলে গেল। এভাবে যতবার সে ইঁদুরটাকে সামনে রাখার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় ইঁদুরটা ততবার ঘুরে তার পিছনে। ক্রমে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকটা ক্রমাগত বনবন করে চারপাশে ঘুরতে থাকল, আর তার মাঝখানে একবার ফুড়ুত করে ইঁদুরটা তার পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে চলে গেল। ভয়ে, ক্লান্তিতে, পরিশ্রমে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ল ধানখেতের মধ্যে।

এই পর্যন্ত পড়েই সন্টু একবার চারদিকে তাকাল। এতরকম ভূতের গল্প সে পড়েছে, কিন্তু গো-ভাগার নাম সে কখনও শোনেনি। পা-দুটো সামনের দিকে ছড়ানো ছিল তার, গা ছমছম করে উঠতেই সে-দুটো গুটিয়ে বসল। পথেঘাটে চলতে কত ইঁদুর তো তার চোখে পড়ে, এর মধ্যে কোন্‌টা যে গো-ভূত সে কী করে জানবে! তাদের বাগানেই কি কম ইঁদুর আছে। এই তো সেদিন চাটুজ্যেদের বাগানে একটা গোরু বাজ পড়ে সন্ধেবেলা মরে গেল। সেটাও নিশ্চয় গো-ভাগা হয়ে গেছে। বিল্টুদা এখনও এ-ব্যাপারটা জানে না। আজ বিকেলেই জানাতে হবে।

আবার পড়তে শুরু করল সন্টু। লোকটা শুধু মরেই গেল না। গো-ভাগা মানুষ মারলে সে-সব লোকরা একঠেঙে ভূত হয়ে যায়। লোকটা একঠেঙে ভূত হয়ে লম্বা তালগাছে বসে থাকে তার এক ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে, তার নীচে দিয়ে যত লোক যায় তাদের লাথি মারে, মুখ থুবড়ে ফেলে দেয় আর হি-হি করে হাসে।

বাপ রে! সন্টুর গা'টা আবার ছমছম করে ওঠে। এ-সব ভূতের নাম আর

ব্যাপার-স্যাপার সে জন্মেও শোনেনি। সে আবার বসে আছে একটা তালগাছের গুঁড়ির কাছেই। বিল্টুদা পাশে থাকলে তার সাহস বেশি থাকে, আপাতত সে খুব নিরাপদ বোধ করল না। বইটা এখনও অনেক বাকি, ফেলে রেখে উঠতেও ইচ্ছে করছে না, এদিকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ ঘুম-ঘুমও পাচ্ছে। এখন, এই ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে ঠাণ্ডা শানের মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে ঘুমনোই ভাল। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ সে চমকে উঠল একটা ঝুনঝুন শব্দ শুনে। সর্বনাশ! গো-ভাগা নাকি! আর ঠিক তার পর মুহূর্তে তার মাথায় কে যেন পিছন থেকে ধাক্কা মারল। মাথাটা ঝিমঝিম করে চোখ অন্ধকার হয়ে এল তার, এ বোধহয় একঠেঙে ভূতের লাথি।

পিছনদিকে কোনোক্রমে ফিরে দেখল, একঠেঙে ভূত নয়, ধাক্কা মারছে বিল্টুদা।

চোখদুটো গোল-গোল করে বিল্টুদা বলছে, "কী রে, খুব যে জমিয়ে গল্পের বই পড়ছিস? এদিকে কড়াইমণ্ডির জঙ্গলে বুনো আম পেকে উঠেছে, তার খবর রাখিস? একদম সিঁদুর-রঙ, চ' চ', পেড়ে আনি।"

সন্টু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বইটা গুঁজে রাখল কাঁঠালগাছের দুটো ঘন কাণ্ডের ভাঁজে, তারপর তরতর করে দুজনে ছুটল ওদের বিশাল বাগানের পরে একটা বিল পেরিয়ে যে ঘন জঙ্গল আছে সেদিকে। হায়! সন্টু যাবার আগে যদি একবারও বুঝতে পারত, যে-ভূতপেত্নিকে সে কখনও কেয়ার করে না, তাদের পাল্লায় এরপর নাস্তানাবুদ হতে হবে তাদের!

॥ ২ ॥

বিল্টু হল সন্টুর মাসতুতো ভাই। তবে 'চোরে চোরে' নয়, ওদের সবাই বলে 'জোড়ে জোড়ে মাসতুতো ভাই' কিংবা মানিকজোড়। দুজনে ভীষণ ভাব। বিল্টুদা তো ভীষণ সাহসী আর বেপরোয়া। ওর সঙ্গে মিশে সন্টুও এখন 'ডোন্ট-কেয়ার' হয়ে গেছে। চোর, পুলিশ, ডাকাত, খুনি, ভূত-পেত্নি কোনো কিছুতেই সে আর ভয় পায় না। অথচ তার মাত্তর এগারো বছর বয়স, আর বিল্টুদার চোদ্দ। মাঝে-মাঝে ঠিক দুক্কুরবেলা দুজনে পাড়ি দেয় গাঁয়ের দক্ষিণদিকে, জলাবিল পেরিয়ে কড়াইমণ্ডির জঙ্গলে।

কড়াইমণ্ডির জঙ্গল এক অজানা রূপকথার দেশ। কতরকম আর রঙ-বেরঙের গাছগাছালি, লতাপাতা, ফলমূল পেকে বুঁদ হয়ে থাকে ডালে ডালে, গন্ধ ছড়ায়। কোথাও বুনোফুলের ঝাঁক ঘিরে মৌমাছি গুনগুন করে। আকাশছোঁয়া সেসব গাছের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের বিস্ময় আর কাটে না। ভরদুপুরেও তেমন রোদ্দুর পৌঁছতে পারে না জঙ্গলের ভিতর, তাই একটা আলো-আঁধারি ভাব। ডাঁশা কুল, বৈঁচি, কামরাঙা তো আছেই, তাছাড়া আমলকীর দু-তিনটে গাছ ওদের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

পাক্কা আধঘণ্টা পরে বিল পেরিয়ে ওরা ঢুকে পড়ল কড়াইমণ্ডির অসাড় জঙ্গলে। শীতের দুপুর বলে রোদের হাঁপ অনেকটা কম, এরকম দুপুরে টইটই করে ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগে।

চলতে চলতে বিল্টুদা পকেট থেকে একমুঠো খোসা-ছাড়ানো বাদাম সন্টুর হাতে দিল, "নে, চিবো।"

খোসা ছাড়িয়ে নুন আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে তেল-চুবচুবে ভাজা বাদাম। গালে ফেলতেই সন্টু জিবে স্বর্গসুখ অনুভব করল। এজন্যই বিল্টুদাকে তার এত ভাল লাগে।

কড়াইমণ্ডির জঙ্গল বেশ বড়ই। কত বড় তা সন্টুর ধারণা নেই। জঙ্গলের গভীরে কখনও যায়নি। আজ হঠাৎ সাহস করে দুজনে অনেক ভিতরে ঢুকে গেল। জঙ্গল

ক্রমশ এত ঘন আর গভীর হয়ে গেছে যে, সূর্যের আলো ভিতরে প্রায় আসে না বললেই চলে। এই ভরদুপুরেও আলো-আঁধারি ভাব কোথাও প্রায় ঘুরঘুট্টি। একটা লাল-হলদে পাখি ক্রমাগত এ-ডাল ও-ডাল করে ওদের অনেকটা ভিতরে নিয়ে গেল। বিল্টুদা যতবার গুলতি তাক করে, ততবারই পাখিটা টুক করে অন্য ডালে উড়ে বসে।

এভাবে ডালপালা লতাপাতা সরিয়ে কিছুটা যাবার পর একটা ছোট খাল চোখে পড়ল ওদের। তরতরে জল, কুলকুল করে বয়ে চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। সবুজ ডাল দুপাশে ঝুঁকে পড়েছে জলের মধ্যে। দুজনেই খুব আশ্চর্য হল। এখানে কোনো খাল আছে বলে জানত না ওরা, খালের পাড় দিয়ে সরু রাস্তা বনের ভিতর মিলিয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা দুজনেই সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল, খেয়াল হতে বুঝল, শীতের বেলা, জঙ্গলের ওপাশে সূর্যদেব প্রায় ডুবু-ডুবু, চারপাশে ক্রমে ঘন হয়ে আসছে অন্ধকার। সন্টু বলে উঠল, "চলো বিল্টুদা, এবার বাড়ির দিকে ফেরা যাক। সন্ধে হয়ে আসছে।"

কিন্তু ফিরতে চাইলেই কি ফেরা যায়। এলোমেলোভাবে চলতে চলতে তারা যে কতদূর সেঁধিয়ে এসেছে বনের ভিতর, তা দুজনের কেউই অনুমান করতে পারল না। পিছন ফিরে দেখে, লতাপাতা কাণ্ডের আড়ালে কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। ঝোপঝাড় ঠেলে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও কোথাও বনের সেই সরু পথ দেখতে পেল না ওরা। বরং একটু পরে ঘুরেফিরে সেই খালের পাড়ে এসে পৌঁছল। সন্টু ভয় পেয়ে বলে উঠল, "কী হবে বিল্টুদা।"

বিল্টুদা জবাব না দিয়ে দূরে আঙুল দিয়ে কী একটা দেখাল। তার আঙুল অনুসরণ করে সন্টু দেখল, জঙ্গলের ভিতর একটা বিশাল বাড়ি। পুরনো জমিদার-বাড়ির মতো চেহারা, তিনতলা তো বটেই, চারতলাও

হতে পারে। প্রায় দু-তিন বিঘে জায়গা নিয়ে বাড়িটার এলাকা, চারপাশে উঁচু পাঁচিল। কড়াইমণ্ডির জঙ্গলের সব ইতিহাস তারা জানে না। এই জঙ্গল থেকে একদিন বৈচিফল এনেছিল বলে সন্টুর মা খুব বকাবকি করে বলেছিলেন, "তোদের সাহস তো বলিহারি, অমন জঙ্গলে কি ঢুকতে আছে? চোর-ডাকাত, সাপ-খোপ, ভূত-প্রেত কতকিছু থাকতে পারে। রাত্তিরে নাকি জঙ্গলের ভিতর আলো জ্বলে।" তো, এসব কথা ওরা ভয়-দেখানো কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। এমন একটা পোড়োবাড়িতে যে ডাকাতদের আস্তানা থাকতে পারে, তা এখন আর ওরা অস্বীকার করতে পারল না।

কিন্তু ডাকাত নয়, একটু পরে যা দেখল, তাতে মুহূর্তে দুজনের বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। দেখে, দুটো কালো মুখ-ঢাকা আলখাল্লা-পরা মূর্তি বড় বাড়িটার দিক থেকে লম্বা-লম্বা ঠ্যাঙ বাড়িয়ে ওদের দিকে আসছে। মূর্তি না বলে ছায়ামূর্তি বলাই ভাল। বিল্টুদা চট করে সন্টুর হাত ধরে হড় হড় করে টেনে একটা বড় গাছের আড়ালে নিয়ে গেল। ছায়ামূর্তি দুটো সোজা এসে দাঁড়াল খালের পাড়ে, ওদের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় কেমন একটা ঠকঠক শব্দ শুনতে পেয়েছিল। শব্দটার রহস্য বুঝতে পারল যখন ছায়ামূর্তিদুটো তাদের গায়ের আলখাল্লাদুটো খুলে একটা পাকুড় গাছের গোড়ায় রাখল। স্রেফ দুটো কংকাল। আলখাল্লা খুলে রেখে কংকালদুটো মুহূর্তে মিলিয়ে গেল জলের মধ্যে।

দৃশ্যটা দেখে দুজনের বুকের মধ্যেই ঢিব-ঢিব শব্দ হচ্ছিল। এই মুহূর্তে এখান থেকে পালানো দরকার, কিন্তু কীভাবে পালাবে বুঝতে পারার আগেই কানে এল আবার হাড়-ঠকঠক শব্দ। এবার লুকোতে গেলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে, কারণ, আরো একটা ছায়ামূর্তি ওদের গাছটার দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধি বার

করল বিল্টুদা। পাকুড়গাছের গোড়া থেকে মুখঢাকা আলখাল্লাদুটো তুলে নিয়ে নিজে একটা পরে ফেলল, অন্যটা পরিয়ে দিল সন্টুকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিটা ওদের কাছে এসে দাঁড়াল।

॥ ৩ ॥

ছায়ামূর্তিটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ বলল, "তোরা কেঁ রে, তোঁদের তো এঁ-পাড়ায়, কঁখনো দেঁখিনি।"

সন্টুর বুকের ভিতরে এমন রেলগাড়ি চলতে শুরু করল যে ওর মনে হল, এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। আলখাল্লার ভিতরে গলগল করে ঘামছে সে, চোখের কাছে একটা জাল-লাগান বলে তার ভিতর দিয়ে ছায়ামূর্তিটাকে দেখতে পাচ্ছে ওরা। এতদিন ভূতপেত্নি নিয়ে এতসব গল্প পড়ার অভিজ্ঞতা আর ডোন্ট-কেয়ার ভাব কোথায় মিলিয়ে গেল লহমায়। সন্টু আর কিছু ভাবার আগেই বিল্টুদা হঠাৎ আলখাল্লার ভেতর দিয়ে বলে উঠল, "আমঁরা আঁগে গাঁয়ে থাঁকতাম, ওঁখানে ভাঁল লাঁগছে না। তাই জঁঙ্গলে চঁলে এঁলাম তোঁমাদের সঁঙ্গে থাঁকব বঁলে।"

হি-হি করে হেসে উঠল ছায়ামূর্তি, হাড়গুলো ঠকঠক করে উঠল অন্ধকারে। আলখাল্লার ভিতর থেকে তার হাসিটা এমন কলকল করে ক্রমাগত বেরুতে থাকল যে, পিলে-চমকে-ওঠা কাকে বলে টের পেল সন্টু। "তাঁ বেঁশ কঁরেছিস, চঁল্ আঁগে আঁমাদের আঁস্তানায় নিয়ে যাঁই।"

ছায়ামূর্তির হাসি শুনে সন্টু বুঝতে পারল, ওরা ধরা পড়ে গেছে। এরপর ওদের অবস্থা যে কী হবে, তা মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেল। ছায়ামূর্তি আগে আগে চলতে শুরু করতেই বিল্টুদা সন্টুকে ইশারা করল অনুসরণ করতে। সর্বনাশ! ওই পোড়োবাড়িটার দিকেই যে যাচ্ছে ওরা।

খুব লম্বা-লম্বা পা ফেলছে ছায়ামূর্তিটা, মাঝে-মাঝে পা যেন মাটি না ছুঁয়েই চলে যাচ্ছে। আর সমস্ত শরীরটা হাওয়ায় হালকা হয়ে ভাসছে বলে মনে হল। এহেন ভূতের সঙ্গে ওরা দুজনে হেঁটে আর পারে না, তাই ছুটছে দুজনে। মিনিট-পনেরো পরে এসে পৌঁছল সেই পোড়োবাড়ির কাছে।

বাড়িটা বহু বছরের পুরনো, পাতলা ইঁটের তৈরি, চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা। পলেস্তারা খসে-খসে এখন সব জায়গায় হাড়-জিরজিরে কংকালের মতো চেহারা হয়েছে, যেন দাঁত বের করে হাসছে হি-হি করে। ভূতদের থাকার মতো প্রকৃষ্ট জায়গাই বটে। তিনতলা বাড়ি হলেও দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশাল। আগে রাজবাড়ি কিংবা সম্ভ্রান্ত জমিদারবাড়ি ছিল বলে মনে হয়।

ছায়ামূর্তির পিছু-পিছু বড়-বড় সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এসে দেখল এখানে-ওখানে আরো অনেক ছায়ামূর্তি ঘুরছে-ফিরছে। একজন বারান্দার কোণে হেলান দিয়ে রয়েছে থামের সঙ্গে, দুজন নাকিসুরে গুজগুজ করছে সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে। একজন বারান্দার কুলুঙ্গিতে গুটিসুটি মেরে বসে আছে পায়ের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে, অন্য একজন ছেঁড়াখোঁড়া সোফাটায় শরীর রেখে পা দুটো তুলে ধরেছে দেওয়ালের উপর। প্রত্যেকেরই শরীর কালো আলখাল্লায় ঢাকা।

যে-ছায়ামূর্তির পিছু-পিছু ওরা আসছিল সেটা হঠাৎ সাঁত করে দেওয়ালের ভিতর দিয়ে মিলিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। ব্যাপার বুঝে ফাঁপরে পড়ল ওরা, ভূতের মতো দেয়াল ভেদ করে তো ওরা আর ভিতরে যেতে পারবে না। বিল্টুদা পট্ করে বুদ্ধি খাটিয়ে পাশের ভাঙা দরজার মধ্য দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল সন্টুকে নিয়ে। ছায়ামূর্তিটা ততক্ষণে সে-ঘর পেরিয়ে বোধহয় অনেকটা চলে গিয়েছিল, সন্টুদের না দেখতে পেয়ে আবার সাঁত করে ফিরে এল ঘরে। বলল,

"কী ব্যাপার, তোরা এত দেরি করছিস কেন? চল্, রানীর দরবারে নিয়ে যাই তোদের।"

রানীর দরবারে যেতে হবে কেন? শুনেই ওদের বুকটা ছাঁত করে উঠল। ছায়ামূর্তিটার কী মতলব বোঝা যাচ্ছে না। এ-দরজা, ও-দরজা, বারান্দার পর বারান্দা পেরিয়ে যেতে লাগল ওরা। পাশ দিয়ে সাঁ-সাঁ করে আরো অনেক ছায়ামূর্তি চলে যাচ্ছে, একবার একটা হাওয়া এসে হঠাৎ দুজনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চলে গেল, বোধহয় এ-ভূতটা অদৃশ্য। আলখাল্লার ভিতর দিয়ে বিল্টুদা আর সন্টু চোখাচোখি করল এক লহমা।

খানিকক্ষণ পরে ওরা এসে পৌঁছল একটা বিশাল হলঘরের মধ্যে। এ-ঘরটার ঘুলঘুলি দিয়ে একটা জ্যোৎস্না-জ্যোৎস্না আলো আসছে, তাই রাত হলেও ঘরের ছবিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সন্টুরা। একদিকে ভাঙা চেয়ার-টেবিল পাতা, চেয়ারে বসে আছে নীল আলখাল্লায় ঢাকা এক ছায়ামূর্তি। লালরঙের পালক সাঁটা রয়েছে আলখাল্লার গায়ে, তাতে ছায়ামূর্তিটাকে বেশ জমকালো দেখাচ্ছিল। তার সামনে ঘরের মেঝেয় বসে আছে আরো তিরিশ-চল্লিশটা ছায়ামূর্তি। সবাই নাকিসুরে কিচমিচ করে কী-সব জিজ্ঞাসা করছে চেয়ারে-বসা ছায়ামূর্তিটাকে আর সে একইরকমভাবে নাকিগলায় তার উত্তর দিচ্ছে, হাত-পা নেড়ে বোঝাচ্ছে তাদের।

যে-ছায়ামূর্তিটা সন্টুদের এখানে নিয়ে এসেছে, সে সোজা চেয়ারে-বসা ছায়ামূর্তির কাছে গিয়ে নিজের একটা পা কপালে ছুঁইয়ে বলল, "রানী মিং মিং, এই পোঁ-ভূতদুটো জঙ্গলে ঘুরঘুর করছিল, আপনার রাজত্বে থাকতে চায়, তাই নিয়ে এলাম।"

তাহলে এই হল রানী, তাই অত লাল পালকের ছড়াছড়ি তার আলখাল্লায়। রানী মিং-মিং বলল, "তা বেশ বেশ। কি নাম তোদের?"

সন্টুর বুকটা হিম হয়ে গেল। কী উত্তর দেবে এখন। নাম না বলতে পারলে এরা ব্যাপারটা নির্ঘাত বুঝে যাবে, আর অমনি ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খেয়ে নেবে। ভয়ে নীল হয়ে সে বিল্টুদার দিকে তাকাল, আর তক্ষুনি বিল্টুদা হাতদুটো ক্যাঙারুগোছের করে কুঁই কুঁই শব্দ করল গলায়। দেখাদেখি সন্টু একই ভঙ্গিতে "উঁ-উঁ" শব্দ করে দেখল।

রানী কী বুঝল কে জানে! দেয়ালে অনেকগুলো চক্কর-বক্কর দাগ কাটা ছিল, হাত লম্বা করে তার পাশে আরো দুটো দাগ কেটে বলল, "যা, বোস এখেনে।" সন্টু বুঝতে পারল, চক্কর-বক্কর দাগগুলো ভূতদের নাম, ওই তালিকায় তাদের নাম যুক্ত হল।

ওরা বসতেই শুরু হল রানী মিং মিং-এর বিচারসভা।

॥ ৪ ॥

ভূতদেরও যে রানীটানি থাকে, তা সন্টুদের জানা ছিল না। রানী মিং মিং ভূতদের নিয়ে দিব্যি রাজত্ব চালাচ্ছে। 'ভূতের রাজত্ব' কথাটা মনে আসতেই সন্টু প্রায় খিক খিক করে হেসে ফেলেছিল, কিন্তু হেসে ফেললেই যে অবধারিত মৃত্যু তা মনে পড়তেই সামলে নিল নিজেকে। ইতিমধ্যে বিল্টুদা তার গায়ে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, এখন বেশ কিছুক্ষণ তাদের এরকম ভূত সেজে থাকতে হবে।

একটু বাদে রানী মিং-মিং-এর বিচারসভা শুরু হল। সন্টু আর বিল্টুদা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল অন্যান্য ভূতদের মাঝখানে। রানী মিং মিং-এর হাতে এখন একটা লাল-নীল বল, সেটা হঠাৎ উপরে ছুঁড়ে দিতেই ছাদে লেগে টং করে একটা শব্দ হল। সন্টু দেখল ছাতের ওই জায়গাটায় একটা ঘন্টা বাঁধা আছে। শব্দ হতেই কালো

আলখাল্লা পরা একটা ভূত দাঁড়িয়ে উঠে নাকিসুরে জানাল, কালাদিঘির পাড়ের বিশাল তালগাছটায় সে আজ প্রায় দশবছর হল আছে, কিন্তু সরকার-বাড়ির বুড়ো চাকরটা মরে ভূত হয়ে এসে দাবি করছে, এ তালগাছ তার মনিবের, তাই এর ওপরে সে-ই থাকবে। এই অন্যায়ের বিচার চাই।

রানী তৎক্ষণাৎ তার পাশে দাঁড়ানো একজন সেপাইগোছের ভূতকে বলল, "এক্ষুনি চাকর-ভূতটাকে বিচারসভায় নিয়ে এসো।"

আর একজন জানাল, বেঁচে থাকতে বুড়ি-বৌ তার সঙ্গে রাতদিন ঝগড়া করত, মরে গিয়ে বুড়ির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু মাসখানেক আগে বুড়ি মরে গিয়ে তাকে আবার ধাওয়া করেছে। যে-আমগাছে সে থাকত, তক্কে-তক্কে বুড়ি হাজির হয়েছে সেখানে, আর ক্ষের গাল পাড়ছে আগের মতো। রানী কিছু বলার আগেই বুড়ো ভূতটার পাশ থেকে উঠল ছোটখাটো চেহারার একটা ছায়ামূর্তি। খ্যানখেনে গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, "কক্ষনো না। বুড়ো নিজেই অকর্মার ঢেঁকি, কুটোগাছটা নাড়বে না, কুঁড়ের বাদশা।"

বুড়ো ভূত কী একটা বলে ফেলেছে, অমনি তার বুড়ি পেত্নি "তবে রে বুড়ো" বলে ধাওয়া করতেই বুড়ো সাঁ করে পালিয়ে গেল বিচারসভা থেকে, পিছন-পিছন বুড়িও ছুটল তার আলখাল্লা সামলাতে-সামলাতে।

সটু ব্যাপার-স্যাপার দেখে আবার হেসে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্টুদার কনুইয়ের খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেল। আর একজন ঢ্যাঙা চেহারার ভূত নাকি গলায় বলতে শুরু করল।

ঠিক এমনি সময় দুটো কংকাল তাদের হাড় ঠক-ঠক করতে-করতে হলঘরে ঢুকে পড়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল। কিছুক্ষণ

পরে বোঝা গেল, তারা আলখাল্লা দুটো পাকুড়গাছের নীচে খুলে রেখেছিল। খালের জলে একটু গা ডুবিয়ে নেবার পরে উপরে এসে আর তাদের আলখাল্লা দুটো খুঁজে পাচ্ছে না। নিশ্চয় কেউ চুরি করেছে। এদিকে বেজায় শীত ধরে গেছে তাদের।

সন্টুর বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল, সে আর কিল্টুদাই তো ওদের পোশাক দুটো চুরি করে পরেছে। আর তাই তো এইসব ভূতদের মধ্যে দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে তখন থেকে। এখন যদি খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তাহলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে ওরা। সন্টুর বুকের স্পন্দন এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল।

রানী কাঁসরঘন্টা বাজবার মতো শব্দ করে খানখানে গলায় বকাবকি করল অনেকক্ষণ, তারপর সেপাইগোছের একজনকে বলল, আরো দুটো পোশাক হাফেজখানা থেকে ওদের দিয়ে দিতে।

যে ছায়ামূর্তিটা কিল্টুদা আর সন্টুকে বনের ভিতর থেকে ধরে এনে এই ভূতের রাজ্যে নিয়ে এসেছে, তার নাম ই-পু। রানী কিছুক্ষণ পরেই সভা ভেঙে দিতে ই-পু বলল, "উঁ-উঁ আর কুঁই-কুঁই, চল্, এবার খেতে যেতে হবে।"

সন্টু কিল্টুদার দিকে তাকাল একবার। অনেকক্ষণ থেকে খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে, এবার কিছু পেটে পড়বে জেনে নিশ্চিন্ত হল।

ই-পু একটা গোলপানা ঘরে নিয়ে গেল ওদের। ঘরটা অন্ধকার, পোড়া-গন্ধ চারদিকে, ফাটাফুটা মেঝে। একে-একে ছায়ামূর্তিগুলো ঘরের ভিতর ঢুকে গোল হয়ে বসে পড়ল। সন্টু আর কিল্টুদাকে নিয়ে ই-পু তার মধ্যে ভিড়ে গেল খাওয়ার জন্যে। নাকিসুরের কিচমিচ শব্দে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়, তার মধ্যে ফুরফুরে চেহারার এক ছায়ামূর্তি ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের সামনে একটা করে পাত্র রেখে

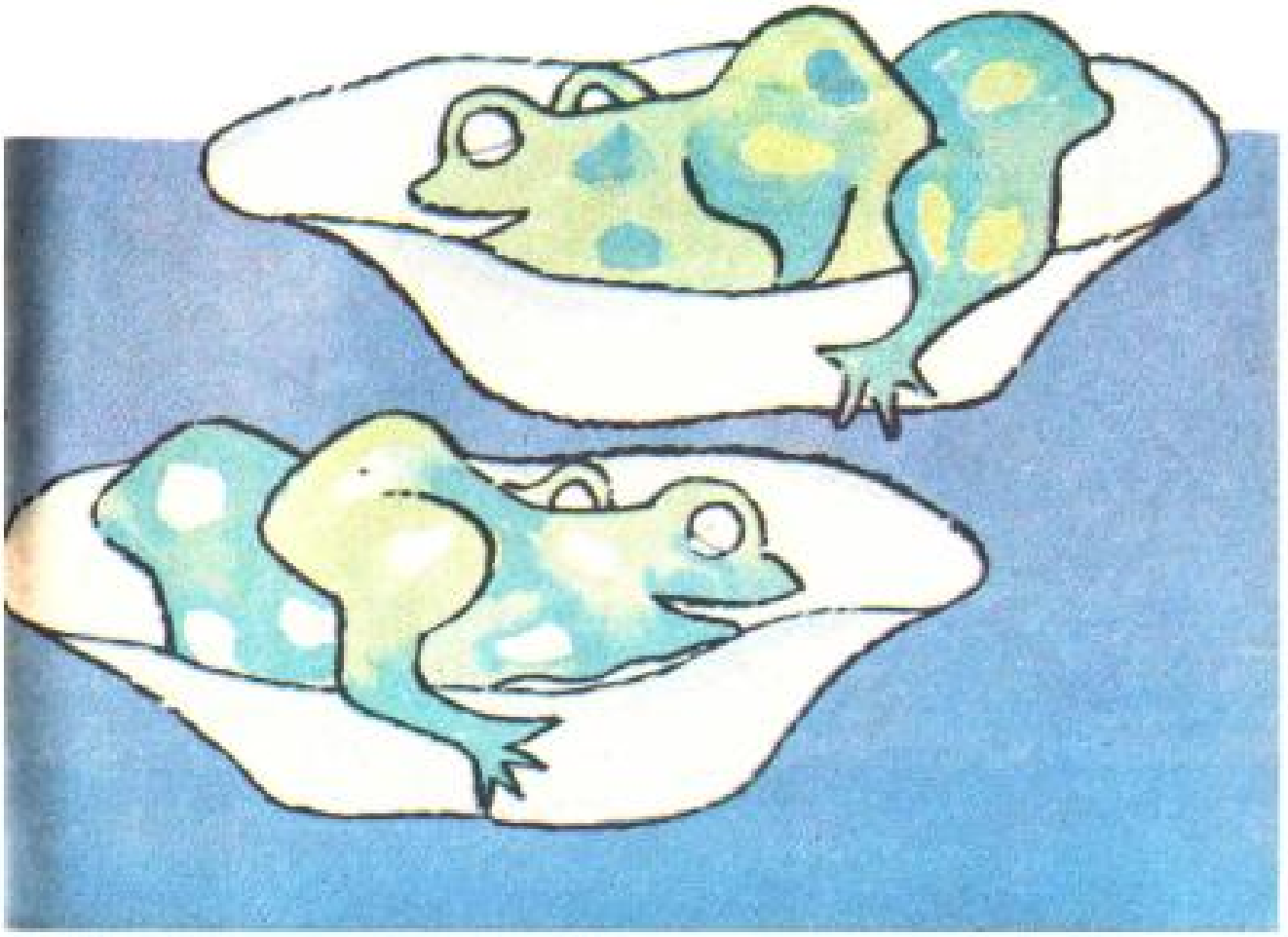

গেল। তার মধ্যে খাবার রাখা। খাবারের চেহারা দেখে সন্টুর কান্না পেয়ে গেল। বিটকেল গন্ধওলা এগুলো কী খাবার। গন্ধে তো বমি এসে যাচ্ছে।

পাত্রের ভিতরে দুটো করে বড় সাইজের ব্যাঙ। ছায়ামূর্তিগুলো সেই ব্যাঙ মহানন্দে চিবোচ্ছে। কিন্তু সন্টুরা সেগুলো না পারছে খেতে, না পারছে ফেলে রাখতে। হঠাৎ বিল্টুদা চট্ করে বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাঙদুটো চুপিচুপি তার আলখাল্লার পকেটে চালান করে দিয়ে মুখ নাড়তে লাগল। দেখাদেখি সন্টুও তাই করল।

কিন্তু এতেও রেহাই নেই। এরপর সেই ছায়ামূর্তি এসে আর একটা করে পাত্র রেখে গেল প্রত্যেকের সামনে। তাতে রয়েছে বড়-বড় মরা গিরগিটি আর শকুনের ডিম। বিল্টুদার মতো সন্টুর আলখাল্লার পকেটও ভারী হয়ে উঠল। সবার খাওয়া শেষ হতে হুঁ-পুর সঙ্গে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। পর-পর কয়েকটা অন্ধকার ঘর পেরিয়ে হুঁ-পু ওদের বাইরে নিয়ে এল। এসে বুক ভরে পরিষ্কার বাতাস নিয়ে শুদ্ধ হল যেন শরীরটা।

হুঁ-পু এবার বলল, "চল, এবার তোদের একটা পেট-ঘুলঘুল-করা দৃশ্য দেখাই।"

॥ ৫ ॥

হুঁ-পুর সঙ্গে সন্টুরা যেখানে পৌঁছল, তা ওদের খুব চেনা জায়গা। যে-সিঁদুরকৌটো আম গাছের ডালে তারা অনেকবার চড়েছে, তার পাশে যে দত্যির মতো বটগাছ, তার নীচেই নাকি বাবা ভোম-ভোম উদয় হবেন। আরো অনেকগুলো ছায়ামূর্তি আগেই পৌঁছেছে সেখানে, কেউ-কেউ বট গাছের ডালে লম্বা-লম্বা পা ঝুলিয়ে বসে আছে, কেউবা ডালে হাঁটু ভাঁজ করে শরীরটাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে, কেউ বা ঝুরিতে ঝুলছে। সন্টুদা বটগাছের গুঁড়ির ওপর জম্পেশ করে

শোকার্ত কলকাতা
শোকার্ত পশ্চিমবঙ্গ

কেউ যদি প্রশ্ন করে 'কলকাতা শহরটা কার' ?
তবে তার উত্তর হবে 'যে ভালবাসে তার'।

হ্যাঁ ! কলকাতাকে যে ভালবাসে কলকাতা যেন তারই হয়ে যায়। সেই জন্যেই "আমাদের কলকাতা", "হামারা কলকততা"-র মত নানান বুলি শোনা যায়। কলকাতা যেমন উদার মনে নানা ভাষাভাষী লোককে তার কোলে আশ্রয় দিয়েছে বিভেদ ভুলে, তেমনি তারাও কলকাতাকে ভালবেসেছেন অকুণ্ঠভাবে।

এমনি এক কলকাতা প্রেমিক নাগরিক ছিলেন শ্রী এম· জি· কুট্টি। সি· এম· ডি· এ-র চীফ একসিকিউটিভ অফিসার শ্রী কুট্টি গত ১৩ই জুলাই তাঁর অফিসে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ মারা গেলেন হৃদরোগে। শহরের উন্নয়নের জন্য তিনি সি এম পি ও, কলকাতা কর্পোরেশন ও ও সি এম ডি এ-তে থেকে যে সব ভাল ভাল কাজ করে গেছেন তার কোন তুলনা হয় না। এই কাজের পিছনে ছিল তাঁর সুগভীর কলকাতা প্রীতি। সম্প্রতি তিনি যে ব্যাপারে খুব বেশী মনোযোগ দিচ্ছিলেন, তা হল, জমির সদ্ব্যবহার। কলকাতা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে, কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছিলেন, ভবিষ্যতের কলকাতা যেন একটু সু-পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে। এজন্যই তাঁর চিন্তা। সি, এম, ডি, এ তাঁর আরম্ভ করা কাজ কতখানি সফল করতে পারবে, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের বড় একটা ক্ষতি হল। আর জান, অতবড় একজন আই এ এস অফিসার পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতাকে এত ভালবেসেছিলেন যে কথা বলার সময়েও পারতপক্ষে তিনি বাংলাভাষাতেই কথা বলতেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু কলকাতাই নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ শোকার্ত !

জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ, ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলিকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত

বসল। মামদো-ভূত আসবে শুনে আজ এই ভূত-সমাগম, একটু পরে রানী মিং-মিংও নাকি আসবে।

মামদো-ভূতটা নাকি ময়ালসাপের বিষ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে ছ-মাস, তারপর ঘুম ভেঙে সে কিছুক্ষণ হৈ-হুল্লোড় করে ভূতদের সঙ্গে, তারপর আবার সাপের বিষ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে বটগাছের কাণ্ড কিংবা শুঁড়ির ভিতর।

মামদো-ভূত নামটাই ভয়ের, তার উপর যার নাম ভোম-ভোম, সে না জানি কীরকম চেহারার! হুঁ-পু জানাল, মানুষ মরে যেমন ভূত হয়ে যায়, তেমনি ভূত মরে গেলে হয় মামদো-ভূত। তবে এক-আধটা ভূত নয়, একশো ভূত মরলে তবে একটা মামদো-ভূত হয়।

হঠাৎ মড়মড় করে উঠল বটগাছের ডালপালা, আর সন্টুরা যেখানে বসে ছিল, সেই শুঁড়ির কৌকড়ানো ঝুরিগুলো উলটে-পালটে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। আর একটু হলেই সন্টু পড়ে যাচ্ছিল আর কি। শুঁড়ির ফাঁক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা। ক্রমশ ধোঁয়াটা ভীষণ হয়ে উঠল। পুঞ্জীভূত মেঘের মতো ঘন ও পুরু তার শরীর, একটু পরে বিশাল ভালুকের মতো চেহারা ধারণ করল সে।

কালো ভালুকের মতো চেহারাটা এবার গমগম শব্দ করে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। শব্দটা শুনে মনে হল মামদো-ভূতটা হাসছে, হাসির দমকে কাঁপছে তার শরীরটা, অথচ হাসির শব্দটা মেঘের গর্জনের মতো ভীষণ শোনাল সন্টুদের কানে।

হাসির মধ্যে ফের গমগমিয়ে উঠল শব্দ : হাঃ হাঃ হাঃ, সব রম্বি (কুশল) তো? অনেকদিন টাম্বু (খোঁজ-খবর) পাইনি। রানী মিং-মিং রিমনি (সুস্থ) আছে তো?

কী অদ্ভুত সব ভাষা! হুঁ-পু সন্টুদের কথাগুলোর মানে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

ভালুকের মতো চেহারার মামদো-ভূতটা ক্রমাগত চেহারা বদলে ফেলছিল। এবার হা-হা করে হাসতেই তার চেহারা আবার অন্যরকম হয়ে গেল। বলল, "কত রুম্বায় (জায়গায়) গেছি, একটা হাতির নাকের ভিতর বেশ জুগনায় (মজায়) ছিলাম, দুটো মেঝের ভিতর দুমাস, একটা পুকুরে ক-দিন, তাছাড়া সমুদ্দুরের ঢেউ হয়ে ক-মাস বেশ কেটেছে। বাকিসময় এই বটগাছের শুঁড়িতে।"

"বেশ বেশ মামা ভোম-ভোম। এবার তোমার কী চাই বলো।" এক ছায়ামূর্তি জিজ্ঞেস করল।

মামদো ভূত শরীরটাকে ওলটাল-পালটাল, তারপর বলল, "তাজা দু-একটা রসনি (কচি ছেলে) যোগাড় কর, আর একডাণ্ডি (পাত্র) বরফ-জুড়নো বাতাস। নিজের হাতে রসনির ঘাড় মটকে রক্ত চুষব আর ওই ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে মৌতাত করব। যা জমবে না। হঃ হঃ হঃ।"

"ওহ্ মামা!" সেই ছায়ামূর্তিটা যেন হেঁচকি তুলল, "এবার জব্বর অর্ডার দিয়েছ মামা। যোগাড় করতে আমার কালঘাম ছুটে যাবে। ঠিক আছে, দুদিন সময় চাই। তবে একটা শর্ত আছে, রসনি নিয়ে এলে আমাকে মামদো-ভূত করে দেবে তো, মামা ভোম-ভোম।"

আবার সেই ভীষণ মেঘের গর্জন, আর কালো পুঞ্জীভূত বিশাল চেহারার ওলট-পালট। হঠাৎ কোত্থেকে একটা ছোটখাটো চেহারার লিকলিকে ছায়ামূর্তি এসে মামার ধোঁয়াটে শরীরের কাছে গিয়ে আদুরে অথচ খ্যানখ্যানে গলায় টেনে টেনে বলল, "তোমার ঘুম ভে-এ-ঙে-ছে মামা ভো-ওম-ভোম? কঁ-অখন ভাঙল! আমি তো জানতে-ই পারিনি।"

আবার বিকট হাসি, কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সেই মেঘ, "তুই সেই মিউ-মিউ না ? হাঃ হাঃ হাঃ আমি তো ভাবছিলাম তুই অ্যাদ্দিনে শাঁকচুন্নি হয়ে গেছিস ?"

সন্টু এই পেত্নিটাকে কিছুক্ষণ আগে চৌধুরীদের বাগানে বসে থাকতে দেখেছিল। মিউ-মিউ বলল, "মামা, তুমি না বলেছিলে আমাকে মামদো-পেত্নি করে দেবে।"

আবার সেই মেঘের বিকট শব্দ— "হাঃ হাঃ হাঃ, তোর আবার মামদো-পেত্নি হবার শখ। হাঃ হাঃ হাঃ।"

খুব অপমানিত বোধ করল মিউ-মিউ। তারপর লম্বা পা বাড়িয়ে একটা বড় পাকুড় গাছের মগডালে একলাফে উঠে চুপ করে বসে রইল। ভঙ্গিটা দেখে খুব মজা পেল ওরা। কিন্তু এরপরেই ঘটল অন্যরকম ঘটনা। হঠাৎ মামদো-ভূতটা কিসের যেন গন্ধ পেয়ে দোমড়াতে লাগল তার শরীর, তারপর গমগমে গলায় বলল, "এখানে কি কোনো রসনি (কচি ছেলে) আছে, গন্ধ ভুরভুর করছে যে।"

শুনে সন্টু আর বিল্টুদার বুকটা একসঙ্গে ছ্যাঁত করে উঠল, দুজনে মুখঢাকা আলখাল্লার ভিতর দিয়ে চোখাচোখি করল একবার। ই-পু বলল, "না না মামা, তোমার ঠাহরে ভুল হয়েছে। এখানে তো কেউ নেই। বোধহয় তোমার জ্বরের খিদে পেয়েছে।"

মেঘের গর্জনে ফের চমকে ওঠে সবাই—"নান্-না, বেশ রসনি রক্তের তাজা গন্ধ পাচ্ছি, ইচ্ছে করছে কচকচ করে মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই।"

বিল্টুদা আর সন্টুর বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সর্বনাশ ! তারা কি এবার ধরা পড়ে যাবে ? সন্টু ভয় পেয়ে রাম-নাম জপ করতে লাগল, হয়তো তাদের শেষ সময় উপস্থিত।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল সেখানে। মিউ-মিউ যে পাকুড়গাছটার ওপরে বসে

ছিল, তার ডালে মামার জ্বলন্ত দৃষ্টি পড়তেই গোটা ঘুই গেছো-বাঁদর টুপ-টুপ করে ঝরে পড়ল মাটির ওপর। তারপর ম্যাজিকের মতো গেছোদুটো সেঁধিয়ে গেল মামদো-ভূতের ভয়ঙ্কর শরীরের মধ্যে। কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত কেবল ছিটকে পড়ল চারপাশে।

দেখে হিম হয়ে গেল সপ্টুদের শরীর। এখন যদি তাদের দিকে নজর পড়ে মামদো-ভূতের, তাহলে তো তাদের অবস্থাও ওরকম হবে।

কিন্তু বাঁদর-দুটো কেটে পড়তেই সেই মেঘের মতো শরীর থম্ মেরে গেল। তারপর আস্তে আস্তে কেমন যেন গুটিয়ে যেতে লাগল, একসময় কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেল অতবড় শরীরটা।

॥ ৬ ॥

হুঁ-পু বলল, "রানী মিং-মিং আমাকে তলব করেছেন, দুটো নতুন স্যাঙাত এসে কিম্ভূত কাণ্ডকারখানা করছে, চল্ তো যাই।"

আবার সেই কড়াইমণ্ডির জঙ্গলে লতাপাতার ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁকফোকর ফুঁড়ে এগুল। হুঁ-পুর কোনো অসুবিধে নেই, সে তো গাছের কাণ্ড ভেদ করে ফুরফুর করে হেঁটে চলেছে, কিন্তু সপ্টুদের তো ইয়া লম্বা ঠ্যাঙ নেই, বাতাসের মতো হাঁটতেও পারছে না। প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে দুজনে হুঁ-পুর পিছু পিছু। চলতে চলতে এক কাণ্ড, একটা শ্যাওড়াগাছের কাছাকাছি এসেছে, হঠাৎ হুঁ-পুর ঘাড়ের উপর লাফ দিয়ে পড়ল একটা অদ্ভুত মূর্তি।

ঘাড়ের উপর ওটা লাফিয়ে পড়তেই হুঁ-পু প্রথমটা চমকে উঠল, তারপর বলল, "আরে শাঁকচুন্নিটা ফের জ্বালাতে এসেছে, কী রে প্যাং-প্যাং, কী খবর বল্?"

শাঁকচুন্নি প্যাং-প্যাং হুঁ-পুর ঘাড় ধরে ঝুলে আদুরে গলায় বলল, "অনেকদিন ছানার ডালনা খাইনি, বড় নোলা ঝরছে ছানার জন্যে, একদিন আমায় খাওয়াও না

বাপু।"

হুঁ-পু শাঁকচুন্নিকে ঘাড় থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু ওটা নাছোড়বান্দা, কিছুতেই নামবে না। হুঁ-পু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "তোর শুধু খাই-খাই। তা যা না, ঘোষেদের বাড়ি যা, ওরা ছানা ডাঁই করে রেখেছে ভাঁড়ার-ঘরে।"

আবার ঘ্যান-ঘ্যান করে উঠল প্যাং-প্যাং, "তাহলে আর তোমাকে বলছি কেন বাপু। ওদের বাড়ি যে ঠাকুরপুজো হয়, ঢুকতেই পারিনে। তোমার সঙ্গে দুটো পো-ভূত আছে, দাও না তাদের পাঠিয়ে।"

সন্টু চমকে উঠল, ঘোষেদের বাড়ি কি ছানা চুরি করতে গিয়ে একটা বদনাম কুড়োবে শেষে। হুঁ-পু অবশ্য শাঁকচুন্নিটাকে পাত্তা দিল না, "না-না, হবে না, যা ভাগ। বরং সরকারবাড়ি যা, খাসা মাছ ভাজছে ওরা, গন্ধ বেরুচ্ছে।

"আ-হা," নোলা টানল প্যাং-প্যাং, তারপর হুঁ-পুর ঘাড় থেকে লাফ মারল সে। আর আশ্চর্য, মাটিতে পড়তেই সে একটা ছাইরঙের বেড়াল হয়ে গেল। চোখ-কটা বেড়ালটা লাফ দিয়ে ছুটল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে,. বোধহয় সরকারবাড়ির দিকেই।

যেতে যেতে যে-জায়গাটায় ওরা পৌঁছল, সেটা একটা শ্মশান, এখানে কখনো আসেনি আগে। চার-পাঁচটা চিতা জ্বলছে। দুটো ঝাপসা চেহারার মূর্তি একপাশে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। হুঁ-পু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কে?"

ঝাপসা চেহারার মূর্তির একজন বলল, "আমি পটল-খুড়ো, বিকেলে হাটে গিয়েছিলাম, ফেরবার পথে গোরুর গাড়ি চাপা পড়েছি, তা এখন বাড়ি ফিরতে চাই।"

আর একজন বলল, "আমি বামুনবাড়ি ভোজ খেয়ে কীরকম যেন হয়ে গেছি। কে একজন এসে রানীর কাছে নিয়ে গেল, কোথাকার রানী চিনিও না, দুটো আলখাল্লার মতো পোশাক ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'নাও পরো।' বাড়ি ফিরতে চাইলাম, বলল, 'আর ফেরা যাবে না।' কী মুশকিলে পড়লাম বলো তো?"

সন্টু বুঝল, এরাই রানীর কাছে গিয়ে গোলমাল বাধিয়ে এসেছে। বোধহয় ভূতেদের দেশে সদ্য এসেছে বলে মানিয়ে নিতে পারছে না।

নতুন ভূত দুটোকে হুঁ-পু বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে, আগে ওই জ্বলন্ত কাঠটাকে হাত দিয়ে তোলো দেখি, তারপর তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব।"

ঝাপসা মূর্তির একটা নিচু হতেই আঁতকে উঠল যেন, ভয়ে দু-পা পিছিয়ে এসে বলল, "পারব না, আগুন দেখে কেমন যেন ভয় করছে।"

হি-হি করে হেসে উঠল হুঁ-পু। "চলো, এবার রানীর কাছে চলো, তোমরা আর কখনো আগুন ছুঁতে পারবে না। আলখাল্লা পরে এখন তোমাদের আমাদের রাজত্বে থেকে যেতে হবে।"

মূর্তিদুটো কেমন বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকল, তারপর হুঁ-পুর পিছু-পিছু হাঁটা শুরু করে দিল।

॥ ৭ ॥

রানীর জিম্মায় নতুন আগন্তুকদের বুঝিয়ে দিয়ে হুঁ-পু আবার জঙ্গলের ভিতরে চলে এল, বাবা বৈষ্ণদত্যি নাকি তাকে স্মরণ করেছে। কড়াহমণ্ডির জঙ্গল পার হয়ে ওরা তিনজন চলে এল শহরের একপ্রান্তে। তিনতলা বাড়ি, বাড়িতে কেউ বাস করে বলে মনে হল না। ঘরে-বারান্দায় ভীষণ ধুলো জমে আছে। ঘরের সামনে একটা বিশাল লন, সেখানে বড়-বড় ঘাস।

দু-তিনটে ঘরের ধুলো মাড়াতে মাড়াতে হঠাৎ একজনের মুখোমুখি হল ওরা। তার পরনে সাদা ধবধবে একটা আলখাল্লা, মুখটা কিন্তু ঢাকা নয়। মুখে দাড়ির মতো রয়েছে। বেশ লম্বা চেহারা, হাতে একটা কমণ্ডলু।

হুঁ-পুকে দেখে বলল, "এসেছিস, এক সের তিল চাই, নইলে ভুজ্যি হবে না।"

হুঁ-পু বোধহয় বাবা বেহ্মদত্যির খাবার-টাবার এনে দেয়, তাই এই তলব।

হুঁ-পুকে তিলের হুকুম দিয়ে বেহ্মদত্যি খড়মের শব্দ তুলে তিনতলা থেকে একতলা, একতলা থেকে তিনতলা ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হুঁ-পু বলল, "এই বাড়িটায় আমাদের নতুন আস্তানা হয়েছে। এক বুড়ো-বুড়ি থাকত এই বাড়িতে, তা একদিন বাসি খাবার খেয়ে দুজনেই পটল তুলেছে। কিন্তু দুজনের কেউই এবাড়ি ছেড়ে নড়ে না। বুড়ো পুজো-আচ্চা করত, অনেক পুন্যি করেছিল বলে মরে গিয়ে বেহ্মদত্যি হয়ে গেছে, আর বুড়ি খুব লোভী ছিল, তাই সে হয়েছে শাঁকচুন্নি। এখন কড়াইমণ্ডির জঙ্গলে এক শ্যাওড়াগাছে থাকে। দুজনে মিলে এ-বাড়ির চার-চারটে ভাড়াটেকে তাড়িয়েছে।

এখন রানী মিং মিং সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মাঝেমধ্যে এ-বাড়িতে মিটিং করে যায়, ভোজসভা বসায়। শুধু হপ্তায়-হপ্তায় বেহ্মদত্যিকে তিল, সেদ্ধভাত, লুচি-পরোটা দিয়ে যেতে হয় খোরাকি হিসেবে।

হঠাৎ আর একটা লিকলিকে চেহারার কালো ছায়ামূর্তি দেখে ওরা সজাগ হয়ে উঠল। হুঁ-পু কী একটা কাজে দোতলায় গেছে, বিল্টু ফিসফিস করে বলল, "এটা ভূত নয় রে সন্টু, বোধহয় আরেকটা শাঁকচুন্নি।"

ছায়ামূর্তিটা কেমন যেন লেংচাতে লেংচাতে আসছে। সন্টু বলল, "বোধহয় এটাই ব্রহ্মদৈত্যের বউ ছিল।"

বিল্টুদা বলল, "বোধহয় এবার একটা মজা হবে।" ইতিমধ্যে হুঁ-পু এসে গেল ওখানে। শাঁকচুন্নিকে দেখে বলল, "এই যে চিনচিন ঠাকরুন, কেমন চলছে? শুক্কুরবারের ভোজসভায় এলে না কেন?"

খ্যানখেনে গলায় শাঁকচুন্নি চেঁচাল, "ও মা, শুক্কুরবার তো রায়েদের বাড়ি পেতে ছেল, একটিন রসগোল্লা সরিয়ে এনেছিলাম যে, সে এক মহাভোজ হয়েছে সেদিন।"

সন্টুর মনে পড়ল, রায়েদের বাড়ি একটিন রসগোল্লা পাওয়া যাচ্ছে না বলে কী হৈ-চৈ সেদিন! তাহলে সেই ব্যাপারটা এই চিনচিন ঠাকরুনের কাণ্ড!

শাঁকচুন্নিটা এ-বাড়িতে কেন এসেছে, একটু পরে বোঝা গেল। লেংচে-লেংচে খুঁজে বার করল ব্রহ্মদৈত্যকে, তারপর বলল, "শ্যাওড়াগাছে ঝুলে থাকতে কী মজা! চলো, শ্যাওড়াগাছে থাকবে, তোমার জন্যে একটা ভাল ডাল বেছে রেখেছি।"

ব্রহ্মদৈত্যের বিশাল আকারের শরীরটা ঘুরে দাঁড়াল, তার গমগমে গলা পাকাবাড়িখানা কাঁপিয়ে দিল যেন, "আবার এসেছিস তুই, বেঁচে থাকতেও খাই-খাই, আর এখন মরে গিয়েও লোভ গেল না তোর। যা ভাগ, বুড়ি শাঁকচুন্নি। আমি এখন আহ্নিক করতে বসব।"

আহ্নিকের নাম শুনে ছুটে পালিয়ে গেল বুড়ি চিনচিন।

॥ ৮ ॥

বেহ্মদত্যির আখড়া থেকে বেরিয়ে হুঁ-পু বলল, "আমাকে একবার কঙ্ককাটার আস্তানায় যেতে হবে, খুব নাকি চটে আছে রানীর ওপর।"

কঙ্ককাটা কে তা এখনো জানে না সন্টুরা। কতরকম ভূতের সন্ধান যে পেয়ে যাচ্ছে ভূতের রাজত্বে এসে তার ঠিক নেই। তাছাড়া রানীর ওপর যে ভূত চটে আছে সে নিশ্চয়ই দারুণ বদমেজাজি। একটা বড় মাঠের কাছে এসে হুঁ-পু বলল, "তোরা দুজনে এখানে একটু দাঁড়া, আমি কঙ্ককাটার খবর নিয়ে আসি।"

হুঁ-পু তখনো নাগালের বাইরে যায়নি। বিল্টুদা বলল ফিসফিস করে, "চ, আমরা

পায়ে-পায়ে ওদিকটায় এগিয়ে দেখি সটকে পড়ার কোনো উপায় আছে কি না।" একটু এগোতেই দেখল একটা কবরখানার মতো, ইটের তৈরি একটা কবরের পাশে কী-সব ইংরেজিতে লেখা। কিল্টুদা বলল, "আরে, এটা তো আমার চেনা জায়গা। একটা সৈনাসমেত ঘোড়াকে কবর দেওয়া আছে এখানে। যুদ্ধের সময় ইংরেজরা কবর দিয়েছিল ওদের।"

অল্প-অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে, তাই দুজনে হনহন করে মাঠের যেদিকটায় আমবাগান, একটু ঝোপঝাপ, সেদিকে এগুতে লাগল। হঠাৎ দেখে, সামনের কাঁচা রাস্তা বেয়ে দুটো লোক আসছে। সন্টু বলল, "কিল্টুদা, এরাও তো মানুষ, এদের কাছে একটু হেল্প চাইলে বোধহয় আমরা বাঁচতে পারি।" কিন্তু লোকদুটো হঠাৎ এতরাতে, এই নির্জন মাঠের ধারে অমন আলখাল্লায় ঢাকা মূর্তি দেখে 'ভূত ভূত' বলে দড়াম করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। দেখেশুনে সন্টুদের তো আক্কেল গুড়ুম। ব্যাপারটা কী! তারা কি তাহলে সত্যি-সত্যিই ভূত হয়ে গেছে দুজনে। কখন মরে গেল তারা?

দু-দুটো সংজ্ঞাহীন মানুষকে পথের ওপর রেখে বিভ্রান্তভাবে কেটে পড়ল ওরা। অল্প-অল্প জ্যোৎস্না মাঠে বেশ ঘোর-ঘোর ভাব লাগিয়েছে। ঠিক এই সময় সন্টুর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ইলেকট্রিক শক লাগল। জ্যোৎস্না-ভেজা রাত্রে অল্প আলোয় মাঠের মাঝখানে তারা যা দেখল তাতে যে-কোনো মানুষেরই বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবার কথা। দেখে, সেই কবর ফুঁড়ে হুশ করে বেরিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া, কালো মিশমিশে রঙ, ভীষণ তেজি আর শক্তিশালী, তার ঘাড়ের লোমগুলো যেমনি চকচকে তেমনি ঝাঁকড়া। আর তার সওয়ারি হয়ে একটা—কী বলা যায়, মুণ্ডহীন ধড় বসে আছে। লোকটা কবন্ধ, অথচ দিব্যি শরীর টান করে সওয়ারি হয়ে বসে আছে, পড়ছে

তো না-ই, উপরন্তু ঘোড়া নিয়ে চরকির মতো ঘুরতে শুরু করল মাঠের চারদিকে। টগবগ-টগবগ শব্দ তুলে যেভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে কবন্ধটা তাতে দুজনেরই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

বিল্টুদা ফিসফিস করে বলল, "এরই নাম কন্ধকাটা রে। হুঁ-পু এর কথাই বলছিল।" ঠিক এই সময় ঘোড়াটা সন্টুদের পাশ দিয়ে ছুটে যেতেই ওরা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। কবন্ধটার হাতে একটা বড় খাপ-খোলা তলোয়ার জ্যোছনার আলোয় ঝিকমিক-ঝিকমিক করছে।

বিল্টুদা আবার ফিসফিস করে বলল, "এর কথাই তো শুনেছিলাম রে, রোজ রাতে কবর থেকে উঠে এসে মাঠময় ছোটাছুটি করে, অনেকে দেখে ভিরমি খেয়ে মরেছে। শুধু তাই নয়, তার খোলা তলোয়ারের সামনে যে-কেউ পড়বে, অমনি কুচ করে গলাটা কাটা যাবে তার। আর তখন থেকে সেই লোকটাও কন্ধকাটা ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

ঘোড়াটা সারা মাঠ ঘুরে ঘুরে এসে দাঁড়াল প্রায় তাদের কাছাকাছি। ঘোড়াটা থামতেই, সেই কবন্ধ লাফ দিয়ে নামল ঘাসের উপর। গলা পর্যন্ত ঢাকা আলখাল্লা, হাতে চকচকে তলোয়ার। সে দুহাত তুলে কী যেন ইশারা করল।

সন্টুরা বুঝতে পারল না, কবন্ধটা ওদের ইশারা করছে কি না। এসময় হুঁ-পু কোত্থেকে এসে হাজির হয়ে ওদের বাঁচাল। হুঁ-পু তার কাছে যেতেই ঘোড়াটা বিকট একটা আওয়াজ করে উঠল, আর কবন্ধ-ভূত তার তলোয়ার বনবন করে ঘুরিয়ে নানারকম সংকেত জানাল। বোঝা গেল, সে দারুণ রেগে রয়েছে। একটু পরে সে ঘোড়া ছুটিয়ে ফের কবরে ঢুকে গেল।

হুঁ-পু হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "নাও ঠ্যালা, কন্ধকাটার জন্যে এখন একশো বাদুড় যোগাড় করতে হবে, সে নাকি কতকাল বাদুড় খায়নি।"

হুঁ-পুর পিছনে ছুটতে ছুটতে সন্টু ভাবল, কন্ধকাটারা যে বাদুড় খেতে ভালবাসে তা তো জানত না। কিন্তু ভাববার বেশি সময় নেই, হুঁ-পু ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

॥ ৯ ॥

সারা রাত ধরে এভাবে ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে পড়ল সন্টু আর তার বিল্টুদা। বেশ ঘুম-ঘুম পাচ্ছে তাদের, অথচ হুঁ-পুকে সে-কথা বলাও যায় না। আর হুঁ-পুও একেবারে চোখে-চোখে আগলে রেখেছে ওদের, একলহমার জন্য হাতছাড়া করছে না। এখন কী উপায় ? কীভাবে এর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যায় ! বিল্টুদা একবার ফিসফিস করে বলেছিল, "বুঝলি সন্টু, একবার চোখের আড়াল হলেই দুজনে ছুট দেব, একছুটে পগার পার। কিন্তু সামনাসামনি কখনো ছুটবি নে, তাহলে আর ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা যাবে না। দেবে ঘাড় মটকে।"

সেটা এতক্ষণে সন্টুও বুঝে ফেলেছে। পথে হাঁটতে-হাঁটতে ওদের সঙ্গে দেখা হল আর এক ছায়ামূর্তির। তার গায়ে আলখাল্লা ধরনের কিছু নেই। তার চোখদুটো কুতকুতে, কপালটা ফোলা, গোদা-গোদা পা, মাথাটা ন্যাড়া, দাঁত নেই। হুঁ-পু-র কাছে ওরা জানতে পারল এ হল প্রেতাত্মা। এই প্রেতাত্মাটার নাম চিঁ-চিঁ, তার গলার আওয়াজও তার নামের মতো।

হুঁ-পু বিল্টুদের বলল, "এই, তোরা এই গাছটার ডালে একটু বোস, আমি চিঁ-চিঁর সঙ্গে একটা কাজ সেরে আসি।" এই না বলে হাত লম্বা করে ওদের দুজনকে বসিয়ে দিল গাছের মগডালে।

হুঁ-পু আর চিঁ-চিঁ চোখের আড়াল হতেই বিল্টুদা বলল, "সন্টু, এই সুযোগ, চ' নেমে পড়ি।"

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে
সূর্যি গেল পাটে ।
খুকু গেল জল আনতে
পদ্ম দিঘির ঘাটে ॥
পদ্ম দিঘির কালো জলে
হরেক রকম ফুল ।
হাঁটুর উপর দুলছে খুকুর
গোছাভরা চুল ॥
Oasis
DOUBLE ACTION HAIR FERTILIZER
ঘন কালো সুন্দর
চুলের জন্য
ওয়েসিস®
ডাবল্ অ্যাকশান্
হেয়ার ফার্টিলাইজার
প্রস্তুত কারক :
HRI
হার্বল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
কলিকাতা-৭০০ ০০৫
সব বড় দোকানে পাওয়া যায় ।

অনেক কষ্টে ওরা গাছ থেকে নেমে দেখল, সামনে একটা ঝোপ-ঝোপ জঙ্গল, তার ভেতর দিয়ে একটা কাঁচা পথ। পথটা জঙ্গলের ভিতরে এগিয়ে গিয়েছে, সেই পথ বরাবর ছুট লাগাল ওরা দুজন। মুখের ঢাকাটা ওরা সরিয়ে ফেলেছে, তাতে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না বটে, কিন্তু লতাপাতা, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ বিল্টুদা সন্টুর হাত ধরে চট করে থেমে গেল, তারপর দুজনে লুকিয়ে পড়ল একটা বড়সড় কাঁঠালগাছের পিছনে। দুটো ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে হনহন করে। সন্টুর বুকটা কেঁপে উঠল, ওদের দেখে ফেলেনি তো ছায়ামূর্তি দুটো!

একটু পরেই আলখাল্লা-পরা মূর্তিদুটো লম্বা-লম্বা পা ফেলে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। ভাগ্যিস ওদের দেখতে পায়নি! একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিল্টুদা বলল, "আয় সন্টু, পালাই।"

আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল দুজনে। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে ছোটার পরে ওরা থামল একটা মাঠের কাছে। মাঠে নতুন লাঙল দেওয়া হয়েছে বলে দৌড়োতে পারছে না ওরা, পায়ে জুতো নেই, তার উপর আলখাল্লাটা ফেলতেও পারছে না। একদণ্ড জিরোবার জন্য ওরা মাঠের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

আর যেই না বসেছে, অমনি চোখে অন্ধকার দেখল দুজনে। কে যেন তাদের দুজনের গলা চেপে ধরে শূন্যে তুলে ধরেছে, আর ঝড়ের বেগে নিয়ে যাচ্ছে অন্য কোথাও। চুল-টুল খাড়া হয়ে উঠেছে, গায়ের আলখাল্লা উড়ছে পতাকার মতো। কোথায় চলেছে তারা?

॥ ১০ ॥

সন্টুর মনে হল, তাদের পিঠে কেউ যেন একজোড়া করে পাখা লাগিয়ে দিয়েছে, আর তাতে ভর করে ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে তারা। সম্ভবত তাদের পালাবার ব্যাপারটা ছায়ামূর্তিদের কেউ দেখে ফেলেছে। এতক্ষণ ভূতের রাজ্যে দিব্যি ধাপ্পা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা, কিন্তু এবার আর নিস্তার নেই। সন্টুর বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল, এবার নির্ঘাত ঘাড় মটকে মেরে ফেলা হবে ওদের।

ঝড়ের বেগে উড়তে উড়তে তারা এসে নামল ইস্কুল-ঘরের মতো বিরাট লম্বা একটা বাড়ির সামনে। জায়গাটা সন্টুর বেশ চেনা চেনা। এই মাঠে সে ফুটবল-খেলা দেখতে এসেছে অনেকবার।

এই মাঠে তারা নিজেরাই নেমে এল, না কেউ তাদের নামিয়ে দিল, সন্টু বুঝতে পারল না। বিল্টুদাও ওর দিকে ছানাবড়া চোখে তাকিয়ে আছে, কথা বলতে পারছে না, কী ভাবে এখানে ঝড়ের মতো উড়ে এল বুঝতে পারছে না। আলখাল্লার ভেতর থেকে মুখটা বার করে সন্টু বলল, "বিল্টুদা, কী হবে?"

বলতে বলতে দেখতে পেল, একটা ছায়ামূর্তি হনহন করে হেঁটে আসছে। দেখতে পেয়ে তাদের বুকের ভেতর আবার হিম হয়ে এল। নাহ্! তারা এই ভূতের রাজ্য থেকে আর নিস্তার পাবে না।

ছায়ামূর্তি কাছে আসতেই সন্টু চিনে ফেলল, এর নাম গাঁ-পে। হুঁ-পুরই বন্ধু। কিছুক্ষণ আগে একে রানীর সভায় দেখেছে, একটা শকুনের ডিম বেশি খেয়ে ফেলেছিল বলে রানী খুব বকে দিয়েছিল। এর আবার কী মতলব কে জানে! গাঁ-পে ওদের দেখতে পেয়েই বলে উঠল, "এই যে পো-ভূতদুটো, কোথায় কেটে পড়ছিলি দুজনে। হুঁ-পু তো তোদের খোঁজে হাল্লা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগ্যিস রমণ্ডির কাছে তোদের দেখতে পেয়েছিলাম।"

রমণ্ডি কী জিনিস বা কোন্ জায়গা তা

বুঝতে পারল না ওরা। গাঁ-পে বলল, "তোদের হুঁ-পুর কাছে নিয়ে গেলে বেশ একটা মজা হবে।" বলে সে এমন হি-হি হি-হি করে হাসতে শুরু করল যে সন্টুর পিলে চমকে উঠল। হুঁ-পু যে কী করবে কে জানে!

কিন্তু হুঁ-পু কোথায়? গাঁ-পে বলল, "তোরা তো আমাদের আখড়া থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছিস, চিনে যেতে পারবি তো?"

বিল্টুদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "হুঁ-হুঁ।" ভাবল, এতে যদি গাঁ-পের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে উলটো ফল হল। গাঁ-পে বলল, "চিনতে পারবি না, মহা মুশকিল তো। আচ্ছা, তাহলে তোদের আর একবার ভাসান দিই হাওয়ায়, যেভাবে রমণ্ডি থেকে ফিরিয়ে এনেছি। বলে আবার দুজনের গলার কাছটা চেপে ধরল, তারপর সজোরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল। চোখে আবার সর্ষেফুল ফোটে ওদের, সেই পাখা লাগিয়ে ওড়ার মতো আবার ভেসে চলল মহাশূন্যের দিকে। দুজনেই পাশাপাশি উড়ছে, অথচ কেউ কাউকে কিছু বলতে পারছে না। এমন অসহায়ের মতো উড়তে উড়তে কতক্ষণ পরে কে জানে, ওরা আবার টিপ্ করে ল্যাণ্ড করল সেই নীচে, যে-মগডালে হুঁ-পু ওদের বসিয়ে রেখে গিয়েছিল।

হুঁ-পু ওদের দেখে হাতে স্বর্গ পেল। স্বর্গ না নরক, ভূতেরা হাতে কী পায় কে জানে! দুজনকে বগলদাবা করে একপাক বাঁই করে ঘুরে গেল। আর নাকি সুরে কী সব বলতে লাগল। তার মধ্যে 'রমণ্ডি' শব্দটা শুনতে পেল ওরা।

রমণ্ডি শব্দটার মানে জানতে পারল ওরা একটু পরে। হুঁ-পু জানাল, ওদের দুজনের নাকি পৃথিবীতে ফিরে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। পৃথিবীতে যাবার ইচ্ছে হলে ভূতেরা যে জায়গায় চলে যায়, তার নাম রমণ্ডি। রমণ্ডিতে গেলেই আস্তে-আস্তে ভূত থেকে প্রেতাত্মা হয়ে যায়। উঁ-উঁ আর কুঁই-কুঁই আর একটু হলেই প্রেতাত্মা হয়ে যাচ্ছিল।

এখন ওদের দুজনকে এই ইচ্ছের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত কী—তাও হুঁ-পু জানিয়ে দিল। ওদের দুজনকেই এখন চুয়াল্লিশটা করে শকুনের ডিম খেতে হবে।

শুনে তো ওদের প্রাণ উড়ে যাবার যোগাড়। হুঁ-পু ওদের রানীর দরবারের পাশের ঘরে এনে হাজির করে বলল, "বোস্, খানসামা ডাকি, শকুনের ডিম আনুক।" আলখাল্লার ভিতর দিয়ে দুজনে দুজনের দিকে তাকাল! এবার কী করবে ওরা?

এবার আর নিস্তার নেই। ভাবতে ভাবতে টুপিপরা খানসামা এল, দু-গামলা ভর্তি শকুনের ডিম নিয়ে। ইয়া বড় বড় ডিম। দেখে তো ওদের দুজনের ভিরমি খাবার যোগাড়।

হুঁ-পু এসে বলল, "নে, চটপট খেয়ে নে।" আলখাল্লার ভিতর দিয়ে ওরা আবার চোখাচোখি করল, তারপর বিল্টুদা এক কাণ্ড করে বসল। চট করে পকেট থেকে বার করল একটা দেশলাই, কখন যেন পথে কুড়িয়ে পেয়েছিল। ফশ্ করে দেশলাই জ্বালতেই অবাক কাণ্ড! কোথায় হুঁ-পু, আর কোথায় রানী মিং-মিং! মুহূর্তে ভূতের রাজত্ব একেবারে ফর্সা। সন্টুর ধড়ে এবার যেন প্রাণ ফিরে এল, আর বিল্টুদাও আনন্দে সন্টুকে নিয়ে তুলে ধরল উঁচুতে, তা-থৈ তা-থৈ নৃত্য করতে লাগল। আর সেই ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল সন্টুর। দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে বিল্টুদা, হাতে ফলসার রাশ। বলছে, "কী রে, গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিস এখানে!"

ছবি : প্রবীর সেন

ঝুলির বেড়াল

বাণীব্রত চক্রবর্তী

রাজীবও আমাদের সঙ্গে মধুবাবুর কোচিংয়ে পড়ে। একটু চাপা প্রকৃতির বলেই তার কাছে তার কাকার কথা কোনোদিন শুনিনি। তবে কোচিংয়ের বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলাম রাজীবের কাকা ক্ষৌণীশ সর্বাধিকারী একাধারে ডিটেকটিভ ও পামিস্ট। বেঙ্গল স্কুলের স্বপন আঢ্য, নিলয় দেব আর আমি মধুবাবুর কোচিংয়ে পড়ছি মাস-দুয়েক হল। সেদিন দুপুরবেলায় বাবা কী একটা কাজে কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিলেন। ফিরে গল্প করেছিলেন, "আজ দুপুরে এক অদ্ভুত লোককে দেখলুম। কলেজ স্কোয়ারের কাছে বিখ্যাত শরবতের দোকানটা দেখে তেষ্টাটা বেড়ে গেল। ঝা-ঝা দুপুর। দোকানে ঢুকে এক গ্লাস লস্যির অর্ডার দিলুম। শরবত ছাড়াও এখানে দা, বঁটি, কাটারি বিক্রি হয়। কেন বলো তো?" আমার কাছ থেকে সদুত্তর পেয়ে বাবা মাথা নেড়ে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, গরমকালে তো শরবত, অন্যসময় ? তাই দুরকম ব্যবসা। সেখানে এক ভদ্রলোককে দেখলুম। উনিও শরবত খাচ্ছিলেন। গায়ে ফতুয়া। মাথায় এলোমেলো চুল। নাকের নীচে নাইন্‌টিনথ সেঞ্চুরির ফ্যাশনের গোঁফ। ভদ্রলোক শরবত খেয়ে একটা রামদা কিনে চলে গেলেন। খদ্দেরদের কেউ-কেউ বলল উনি ডিটেকটিভ। আবার কেউ-কেউ বলল উনি নাকি একজন পামিস্ট। জিজ্ঞেস করলুম, তা ভদ্রলোকের নামটি কী ? দোকানের মালিক ক্যাশ-কাউন্টার থেকে ভারী গলায় বললেন, " ক্ষৌণীশ সর্বাধিকারী।"

আমার কাছে সব শুনে স্বপন বলেছিল, "শরবত ও দা-কাটারি। ডিটেকটিভ ও

পামিস্ট ।"

অবশেষে আমরা রাজীবদের বাড়িতে গেলাম। ঠিকানা জানতাম না। শুধু শুনেছিলাম রাজীব নেবুতলা পার্কের কাছে থাকে। সেখানে একটা চায়ের দোকানে ক্ষৌণীশ সর্বাধিকারীর নাম বলতেই বাড়িটার হদিস মিলল। সদর দরজা হাট করে খোলা। সামনে উঠোন। উঠোনের চারপাশে রক। স্বপন ডাকল, "রাজীব। রাজীব।" কয়েকবার ডাকার পর কোণের ঘর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মাথায় অবিন্যস্ত চুল। গায়ে ফতুয়া। মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরেছেন। পায়ে বিদ্যাসাগরি চটি। সেপাইদের মতন পাকানো গোঁফ। হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। স্বপন আমাকে ঠেলল। আমি নিলয়কে। আমাদের দ্বিধা লক্ষ করে উনি বললেন, "তোমাদের তিনজনকেই ডাকছি।" তিনজনে গুটি-গুটি এগিয়ে গেলাম।

"এসো, আমার ঘরে এসো।" উনি আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। একটা কালো বেড়াল লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উনি চোখ পাকিয়ে ডাকলেন, "ডিংডং। ডিংডং।" ওমা। কী আশ্চর্য। বেড়ালটা পায়ে পায়ে আবার ঘরে ফিরে এল। লাফ দিয়ে ওঁর কোলে উঠে পড়ল। জানলার পাশে বেতের চেয়ার আর একটা নিচু টেবিল। উনি চেয়ারে বসে বললেন, "তোমরা খাটে বসো।" আমরা খাটের ওপর বসলাম। ঘরটি অদ্ভুত। দুটি আলমারি ভর্তি বই। দেওয়ালে নানারকম ফুল ও জন্তু-জানোয়ারের ছবি। উনি একমনে কিছুক্ষণ ডিংডংকে আদর করলেন, তারপর আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা রাজুর বন্ধু!" আমরা মাথা নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ।" উনি বললেন, "কিন্তু রাজু তো বাড়িতে নেই। উলুবেড়েতে পিসির কাছে গেছে।" নিলয় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি রাজীবের কাকা?" ডিংডং-এর গায়ে হাত বুলোতে

বুলোতে উনি মুচকি হাসলেন। স্বপন বলল, "আমাদের আপনার সঙ্গেই দরকার।" উনি একদৃষ্টে স্বপনের দিকে চেয়ে ছিলেন। তারপর বললেন, "তুমি যে দেখছি ঘুড়িপাগল ছেলে।" ঘুরে আমার ও নিলয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি তবলা আর তুমি তো ক্যারাম নিয়ে মত্ত।" আমরা স্তম্ভিত। উনি আমাদের চিনতেন না। কোনোদিন দেখেননি।

এবার আমাকেই মুখ খুলতে হল, "একটা প্রবলেমে পড়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি। আপনার কথা খুব শুনেছি।" থামলাম। উনি চোখ বুজে আমার কথা শুনছিলেন। আবার শুরু করলাম, "আমরা তিনজনে বেঙ্গল স্কুলে পড়ি। ইদানীং আমাদের স্কুলে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে।।" হাত তুলে আমাকে থামতে বললেন। ডিংডংকে মেঝেতে ছেড়ে দিলেন। ডিংডং ওঁর পায়ের নীচে গা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ভদ্রলোকের হাতের কাছের টেবিলে একটা জলভরা কাঁচের গ্লাসে কয়েকটা গোলাপ। একটা ফুল তুলে নিয়ে শুঁকতে-শুঁকতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোশ্চেন আউট হয়ে যাচ্ছে তো?" আমরা তিনজনে বোধহয় খাট থেকে পড়েই যাচ্ছিলাম। হলফ করে বলতে পারি এমন অবাক কোনোদিন হইনি। উনি ফুল শুঁকতে শুঁকতে বললেন, "তোমাদের হেডমাস্টারমশাইয়ের নিশ্চয়ই আহার-নিদ্রা ঘুচেছে? তা অবশ্য হওয়ারই কথা।" নিলয় আর চুপ করে থাকতে পারল না, বলল, "এর একটা বিহিত আপনাকে করতেই হবে।" উনি কোনো কথা বললেন না। তেমনি ফুল শুঁকতে লাগলেন। যেন মুঘল সম্রাট সিংহাসনে বসে গোলাপ শুঁকছেন।

স্বপন বলল, "বিশ্বাস করুন, আমাদের স্যারেরা খুব ভাল। হেডস্যারের মতন অমন ভাল লোক দেখতেই পাওয়া যায় না। সদাশিব তো সদাশিবই। আর তা ছাড়া কাছাকাছি কোনো প্রেসেও কোশ্চেন ছাপা হয় না। কোথায় ছাপা হয় তা শুধু হেডস্যারই জানেন।" স্বপন থামতেই আমি শুরু করি, "তবু পরীক্ষার কয়েকদিন আগেই অনেক সাবজেক্টের কোশ্চেন আউট হয়ে যায়।" এবার ফুলটা কাঁচের গ্লাসে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু কীভাবে?" নিলয় বলল, "সেটাও অদ্ভুত ভাবে। ডাকে যে ভাবে চিঠি আসে সেভাবেই আসে। সাধারণত লেখাপড়ায় যারা খারাপ তারাই খাম পাচ্ছে। খামের ভেতরে কিছু কিছু সাবজেক্টের কোশ্চেন। ছাপা নয়, হাতে লেখা। শুধু অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময়ই এই ঘটনা ঘটছে। এই নিয়ে দুবার একই ঘটনা ঘটল।" রাজীবের কাকা চুপ করে ছিলেন। চোখ বুজে যেন ধ্যান করছেন। আমরা তিনজন অপেক্ষা করে আছি। অবশেষে উনি চোখ মেলে বললেন "যাও, তোমরা বাড়ি যাও। আমাকে একটু ভাবতে দাও।"

ইন্দ্রমিত্র
এক বিশ্বাসী
গবেষকের নাম

ইন্দ্রমিত্র এমন এক বিশ্বাসী গবেষকের নাম, বইতে দেবার আগে প্রতিটি তথ্যকে যিনি নিজে যাচাই করে নেন। তাঁর যে-কোনও লেখাতেই তাই এমন বহু গল্পের মতো ঘটনা থাকে সেগুলি মোটেও গল্পকথা নয়, নির্ভেজাল বাস্তব ঘটনা। ছোটদের জন্য তাঁর দুটি বই। একটিতে তিনি শুনিয়েছেন বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনের কাহিনী, নাম 'বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা'; অন্য বইটিতে তিনি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শুনিয়েছেন বিস্তর সরস কাহিনী বা খোশগল্প। সে-বইটি হল, 'শরৎ কথামালা'। বাংলা সাহিত্যের এই আশ্চর্য দুই শিক্‌পালকে ছোটদের একেবারে কাছের মানুষ করে হাজির করেছেন ইন্দ্রমিত্র। মনেই হয় না জীবনী পড়ছি, মনে হয় দারুণ মজাদার সব গল্প পড়ছি।

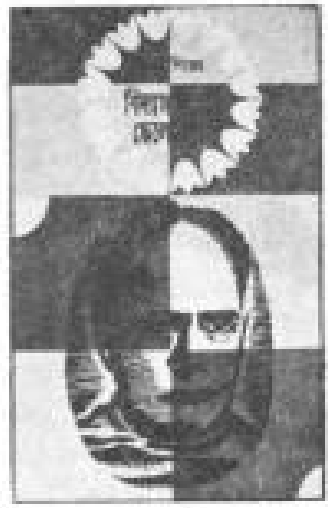

ইন্দ্র মিত্রের বই

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৮·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

সেদিন কোচিংয়ে পৌঁছতেই মধুবাবু বললেন, "বসো, বসো, আজ তোমাদের একটা সুখবর দিই।" কিন্তু দেওয়া হল না। বাইরে থেকে কে যেন ডাকলেন, "মধুবাবু, আছেন নাকি ?" এ যে হেডস্যারের গলা। শুনেছি ছুটির দিনে উনি এখানে দাবা খেলতে আসেন। মধুবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই, তোরা আজ যা। আজ তোদের ছুটি।" আমরা উঠছি এমন সময় হেডস্যার এলেন। তাঁকে দেখে কষ্ট হল। উনি যেন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। মধুবাবু এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আসুন সদাশিববাবু। আপনার কথাই ভাবছিলুম। বসুন, আজ আপনাকে একটা সুখবর দিই।" কিন্তু এবারেও তাঁর সুখবরটা দেওয়া হল না। অতর্কিতে একটা কালো বেড়াল ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আরে! এ যে ডিংডং। ক্ষৌণীশ সর্বাধিকারীও হাজির। তিনি হাত তুলে মধুবাবুকে থামিয়ে হেডস্যারের দিকে ফিরে বললেন, "মধুবাবুর স্কুল অ্যাফিলিয়েশন পেয়েছে। হ্যাঁ, সুখবরই বটে। মধুবাবু যখন স্কুলের সেক্রেটারি।" তারপর ঘুরে মধুবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "মধুবাবু, আমিও কিন্তু একটা সুখবর দিতে এসেছি।" রাজীবের কাকা থামলেন। মধুবাবু চটে আগুন। বললেন, "আপনি কে হে মশাই ? বলা নেই, কওয়া নেই, বেড়াল নিয়ে ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকে পড়েছেন ?" রাজীবের কাকা মুচকি হেসে বললেন, "রাজুটা এখনও উলুবেড়ে থেকে ফিরল না। থাকলে সেও দেখত। ঝুলি থেকে তবে বেড়াল বের করি ? বুঝলেন সদাশিববাবু, কোশ্চেন আউটের মূলে কে জানেন ? এই মাধবচন্দ্র বটব্যাল।"

একতলার কোণের সেই ঘর। কাকার কোলে ডিংডং। খাটের ওপর আমরা তিনজন ও রাজু। এখানে আজ আমাদের নেমন্তন্ন। ডিংডংকে আদর করতে করতে কাকা শুরু করলেন, "যারা ঘুড়ি ওড়ায়, ক্যারাম খেলে, তবলা বাজায় তাদের হাত দেখলে বোঝা যায়। মাঞ্জায় আঙুল কেটে গেলে দাগ থাকে। ক্যারামপটু আঙুল সময় নেই অসময় নেই শূন্যে স্ট্রাইক করে, তেমনি তবলা-পাগল হাত কাছে যা পায় তাই বাজায়। স্কুলে যখন চরম কোনো সমস্যা দেখা দেয়, আর তা নিয়ে তিনটে ছাত্র ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লে বোঝা যায় সেটা কোশ্চেন আউটেরই ব্যাপার। তদন্তে নেমে পড়ে একে একে সব কিছুই জানা গেল।" কাকা থামলেন এবং হাত বাড়িয়ে আজও জলভরা কাঁচের গ্লাস থেকে গোলাপ তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগলেন। ফুল রেখে আবার বলতে শুরু করলেন, "সদাশিববাবু মধুবাবুর বাড়িতে ছুটির দিন দাবা খেলতে যেতেন। রাজু কীরকম পড়াশোনা করছে সেই খোঁজের ছলে একদিন তোমাদের কোচিংয়ে গেলুম। ছুটির দিন। দুই বন্ধু দাবায় বসেছেন। সেদিন তোমরা যদি আমায় দেখতে, চিনতেই পারতে না। মধুবাবু দাবার চালে চালে সদাশিববাবুর পেটের কথা টেনে হিঁচড়ে বের করতেন। সেই চালটা মধুবাবুর ওপর চেলেছি। অবিশ্যি এর জন্যে কয়েকহাত দাবা খেলতে হয়েছে। রাজীবের ছোটমামা তো সেজেছিলুমই। মধুবাবু একটা স্কুলের সেক্রেটারি। প্রতিযোগী স্কুল বেঙ্গল স্কুল। কোনো বদনাম আরোপ করে যদি স্কুলটাকে দমানো যায় মধুবাবুর এই চেষ্টাই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করছিলেন নিজের স্কুলটাকে অ্যাফিলিয়েটেড করতে। কৌশলে সদাশিববাবুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন কোথায় কোশ্চেন পেপার ছাপা হয়। তারপর ট্যাংরার ঐ ছাপাখানার সঙ্গে সব ব্যবস্থা আর কি।"

ছবি: দেবাশিস দেব

কিশোর-ক্লাসিক

রবিনসন ক্রুসো

ড্যানিয়েল ডিফো

ভাষান্তর : শেখর বসু

॥ ২ ॥

আগের মতো দিন কেটে যেতে লাগল ক্রুসোর। হঠাৎ একদিন দেখলেন, সমুদ্রের তীর থেকে ধোঁয়া উঠছে আকাশে। পাহাড়ে উঠতেই চোখে পড়ল, দূরে ন'জন জংলি মানুষ গোল হয়ে বসে আছে। তাদের মধ্যিখানে আগুন। সেই আগুনে কী যেন পোড়ানো হচ্ছে। একটু পরে ঝলসানো মাংস খেয়ে দুটো লম্বা নৌকোয় চেপে সমুদ্রে মিলিয়ে গেল জংলিরা।

এই ঘটনার পরে আরও একটি বছর কেটে গেল নির্ঝঞ্ঝাটে। তারপর এক সকালে দেখলেন, গোটা-পাঁচেক নৌকো এসে তীরে ভিড়েছে। প্রতিটি নৌকোয় জনা-ছয়েক জংলি। ঘরে ফিরে বন্দুকগুলো চটপট ঠিক করে নিলেন ক্রুসো। কিন্তু এবারও আক্রমণ করতে এল না জংলিরা। ঘরের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটাবার পরে ক্রুসো একটা বন্দুক হাতে নিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠলেন। সেখান থেকে এক ভয়ংকর দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর।

আগুনের চারদিকে জংলিরা ঘুরে ঘুরে নাচছে। একটু পরে নৌকো থেকে হাত-বাঁধা দুটো লোককে নিয়ে আসা হল। একজনের মাথায় লাঠির বাড়ি মারতেই মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। পড়ামাত্তর জংলিরা তাকে টুকরো-টুকরো করে কাটতে শুরু করে দিল। এই সুযোগে বাকি লোকটা কোনোরকমে হাতের বাঁধন খুলে ছুট লাগাল প্রচণ্ড জোরে। তাকে ধরবার জন্যে তার পেছনে ছুটল তিনজন জংলি। তিনজনের মধ্যে একজন থেমে গেল একটু পরে, কিন্তু বাকি দুজন নাছোড়। বন্দী লোকটা ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছিল ক্রুসোর দিকে।

লোকটাকে ধরে ফেলে প্রায়। তাকে বাঁচাবার জন্যে ঠিক পেছনের জংলিটাকে গুলি করে ফেলে দিলেন ক্রুসো। তাই দেখে দ্বিতীয় জংলিটা তীর-ধনুক বার করল। সঙ্গে সঙ্গে তাকেও গুলি করলেন ক্রুসো। যাকে বাঁচালেন সে-লোকটাও জংলি। জংলিটা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ক্রুসো হাত নেড়ে অভয় দিতেই সে ছুটে এসে ক্রুসোর পায়ের ওপর পড়ল।

লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে কাট্রি হাউসে গেলেন ক্রুসো। তারপর তাকে খেতে দিলেন শুকনো আঙুর, রুটি আর জল। লোকটার ভাষা বোঝেন না ক্রুসো, কিন্তু এই নির্জন দ্বীপে দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আবার মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে খুব ভাল লাগল তাঁর। কৃতজ্ঞ জংলি লোকটা কয়েক দিনের মধ্যে ক্রুসোর খুব অনুগত হয়ে উঠল। লোকটা বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল,

গায়ের রঙ বাদামি। বয়েস বোধহয় বছর-ছাব্বিশেক হবে। ইঙ্গিতেই কথাবার্তা চলত দুজনের মধ্যে। ক্রুসো ঠিক করলেন ওকে ইংরেজি শেখাবেন। শুক্রবারে ওকে পেয়েছেন বলে ওর নাম দিলেন 'ফ্রাইডে'।

মাস্টারমশাই হিসেবে ক্রুসো খুব ভাল। ফ্রাইডেও বেশ মনোযোগী ছাত্র। ফলে, অল্প দিনেই কাজ চালাবার মতো ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি শিখে গেল ফ্রাইডে। ওর কাছ থেকেই ক্রুসো একদিন শুনলেন জংলিদের লড়াইয়ের বিচিত্র কথা। যে-দল জেতে সে-দলের লোকরা বন্দীদের পুড়িয়ে খেয়ে ফেলে।

শুনে ক্রুসো শিউরে উঠে বললেন, "ইশ্! জঘন্য!"

ক্রুসোর সঙ্গে থেকে থেকে ফ্রাইডে অনেকখানি সভ্য হয়ে উঠেছিল, তাই ও সঙ্গে সঙ্গে সদ্য-শেখা ইংরেজিতে উত্তর দিল, "ইয়েস, ব্যাড, ইট'স ভেরি, ভেরি ব্যাড টু ইট ম্যানস্।"

ফ্রাইডে আর একটা চাঞ্চল্যকর খবর শোনাল ক্রুসোকে। কিছুকাল আগে একটা নৌকোয় চেপে সতেরোজন সাদা মানুষ এসেছে ওদের দেশে। ক্রুসো চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর? তোমরা কি তাদের খেয়ে ফেলেছ?" ফ্রাইডে লজ্জা

জংলিদের সঙ্গে জোর লড়াই

পেয়ে বলল, "ন্না, ওদের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে।"

কথাটা শুনে ক্রুসো স্বপ্ন দেখলেন, ওই সতেরোজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটা জাহাজ বানাতে পারলে দেশে ফেরা যেতে পারে! পরদিন সকালে ফ্রাইডেকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতীরে এলেন তিনি। আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার ছিল। হঠাৎ দূরের একখণ্ড দ্বীপের দিকে আঙুল তুলে লাফিয়ে উঠে ফ্রাইডে বলল, "ওই আমার দেশ।"

ক্রুসো বললেন, "তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, যাও তুমি তোমার দেশে চলে যাও।"

একই কথা কয়েকবার শুনে ফ্রাইডে এত দুঃখ পেল যে, হাঁটু মুড়ে বসে ক্রুসোর হাতে কুড়ুল তুলে দিয়ে বলল, "আপনি বরং আমাকে মেরে ফেলুন, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতে বলবেন না।" ফ্রাইডের চোখে জল এসে গিয়েছিল। অভিভূত হয়ে ক্রুসো বললেন, "তোমাকে আর কখনোই আমি চলে যেতে বলব না।"

জংলিদের এলাকায় গিয়ে শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধার করার জন্যে ক্রুসো আর ফ্রাইডে একমাস ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে একটা নৌকো বানালেন। কিন্তু, নৌকোটা জলে নামাবার আগেই বর্ষা নামল। অগত্যা যাত্রা পিছিয়ে দিতে হল মাস তিনেকের জন্যে। এদিকে আবার মারাত্মক এক ঘটনা। এক সকালে ফ্রাইডে ছুটে এসে ক্রুসোকে খবর দিল, আবার এসেছে জংলিরা।

জংলিদের সংখ্যা একুশ। সঙ্গে দুজন বন্দী। জংলিরা একজনকে কেটেকুটে আগুনে পোড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ক্রুসো আঁতকে উঠে দেখলেন, দ্বিতীয় বন্দীটি শ্বেতাঙ্গ। বাঁচাতেই হবে লোকটাকে। ক্রুসো আর ফ্রাইডের বন্দুক গর্জে উঠল একসঙ্গে। কয়েক ঝাঁক গুলি। মারা পড়ল পাঁচ জন জংলি, আহত হল অনেকে। বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতেই ক্রুসো উদ্ধার করলেন শ্বেতাঙ্গ বন্দীটিকে। বন্দী একজন স্পেনিয়ার্ড। তাঁর হাতেও বন্দুক তুলে দিলেন ক্রুসো। আর একদফা লড়াইয়ের পরে জংলিরা নৌকোয় চেপে পালাল। একটা নৌকো ওরা ফেলে গিয়েছিল তীরে। তার মধ্যে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেল ফ্রাইডের বাবাকে। কী ব্যাপার?

আসলে হয়েছে কি, শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে দু'দল জংলির মধ্যে ঝগড়া বাধে। তার ফলে এক দল এক রাতে এসে স্পেনিয়ার্ডকে তুলে নেয়। বাধা দেয় ফ্রাইডের বাবা। তখন তারা তাকেও বন্দী করে। বাকি ঘটনা ঘটেছে এই দ্বীপে।

স্পেনিয়ার্ড জানালেন, ওঁদের জাহাজডুবি হয়েছে। প্রাণে বেঁচেছে মাত্র সতেরো জন। তিনি ছাড়া বাকি সবাই এখন ওই জংলিদের আস্তানায়। ইতিমধ্যে কোনো অঘটন ঘটে গেছে কি না কে জানে! কিন্তু আর দেরি করা ঠিক হবে না। সশস্ত্র স্পেনিয়ার্ড ফ্রাইডের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ওই নৌকোয় চেপে উদ্ধার করতে চললেন সঙ্গীদের।

অল্প সময়ের ব্যবধানে ওই দ্বীপে আরও একটি ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল। এবারও ফ্রাইডে দৌড়ে এসে খবর দিল ক্রুসোকে—দ্বীপের দিকে একটা নৌকো আসছে। নৌকো? ক্রুসো পাহাড়ের ওপর উঠে দেখলেন, একটা ইংলিশ জাহাজ নোঙর ফেলেছে দূরে। জাহাজের নৌকোয় চেপে দ্বীপে এসে যারা নামল তারাও ইংরেজ। তিনজন বন্দীকে দ্বীপে নামাল তারা। বন্দীদের হাত-পা বাঁধা। ওদের তীরে ফেলে রেখে সবাই বেড়াতে-বেড়াতে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল।

লোকগুলোর ওপর চোখ রাখলেন ক্রুসো। ওরা জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে শুয়ে পড়ল মাটিতে। শুয়েই ঘুম। এই সুযোগে ক্রুসো এসে

বন্দীদের মুক্ত করলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন। তিনি জানালেন, বিদ্রোহী নাবিকরা জাহাজ দখল করে তাঁকে আর তাঁর দুজন অফিসারকে এই দ্বীপে ফেলে দিতে এসেছে। ক্রুসোরা যখন জঙ্গলের আড়ালে তখন জাহাজ থেকে বিদ্রোহী নাবিকদের দ্বিতীয় দল এসে পৌঁছল তীরে।

ক্রুসো বুদ্ধি খাটিয়ে বিদ্রোহীদের বিচ্ছিন্ন করলেন প্রথমে। তারপর আক্রমণ। গুলির

এর পর সুইস ফ্যামিলি রবিনসন

আঘাতে নিহত হল বিদ্রোহীদের দুই নেতা, জখম হল বেশ কয়েকজন। কিছুক্ষণ পরে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করল। ক্রুসো বললেন, "আপাতত তোমরা এই নির্জন দ্বীপে থাকো। পরে এখানে আরও দুজন আসবে। একজন স্পেনিয়ার্ড, আর একজন ফ্রাইডের বাবা। তাদের এই চিঠিটা দিয়ে বলবে, আমরা দেশে ফিরেই সবাইকে উদ্ধার করার জন্যে জাহাজ পাঠাব।"

ক্যাপ্টেন আগেই কথা দিয়েছিলেন ক্রুসো আর ফ্রাইডেকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরবেন। জাহাজে ওঠার আগে ক্রুসো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সঙ্গে নিলেন তাঁর সেই ছাগলের চামড়ার টুপি, ছাতা আর পোষা তোতাপাখি। নির্জন এই দ্বীপে ক্রুসো সব মিলিয়ে ছিলেন ২৮ বছর ২ মাস ১৯ দিন। জাহাজ ভাসতেই তিনি তাঁর প্রিয় দ্বীপের দিকে তাকালেন শেষবারের মতো।

জাহাজ ওই দ্বীপের কাছ থেকে নোঙর তুলেছিল ১৬৮৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর। ইংল্যাণ্ডে পৌঁছল ১৬৮৭ সালের ১১ জুন। বেচারা ক্রুসো ঘরে ফেরেননি টানা পঁয়ত্রিশ বছর। (সমাপ্ত)

ড্যানিয়েল ডিফো (১৬৬০-১৭৩১)

প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক ডিফো পাঁচাশার ওপর বই, প্যাম্ফলেট ইত্যাদি লিখেছেন, কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ৫৯ বছর বয়সে। প্রথম উপন্যাসের নাম 'দি লাইফ অ্যাণ্ড স্ট্রেঞ্জ সারপ্রাইজিং অ্যাডভেঞ্চারস অব রবিনসন ক্রুসো'। সরকারি চাকরি, সাংবাদিকতা ইত্যাদি নানা পেশা গ্রহণ করেছিলেন নানা বয়সে। বড় মাপের একজন ব্যবসায়ী হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন ডিফো।

রবিনসন ক্রুসোর প্রকাশকাল ১৭১৯। গ্রন্থটির অকল্পনীয় সাফল্য দেখে ডিফো ছ বছরে ছটি উপন্যাস লিখে ফেলেন। তার মধ্যে আছে 'দি ফারেদার অ্যাডভেঞ্চারস অব রবিনসন ক্রুসো' এবং 'দি লাইফ, অ্যাডভেঞ্চারস অ্যাণ্ড পাইরেসিজ অব দ্য ফেমাস ক্যাপ্টেন সিঙ্গলটন'। রবিনসন ক্রুসো একটি প্রকৃত ঘটনার সূত্র অবলম্বন করে লেখা। আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক নামে একজন নাবিক চিলির কাছাকাছি জনমানবশূন্য একটি দ্বীপে কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে ডিফো উদ্দীপ্ত হয়ে রবিনসন ক্রুসো রচনা করেন।

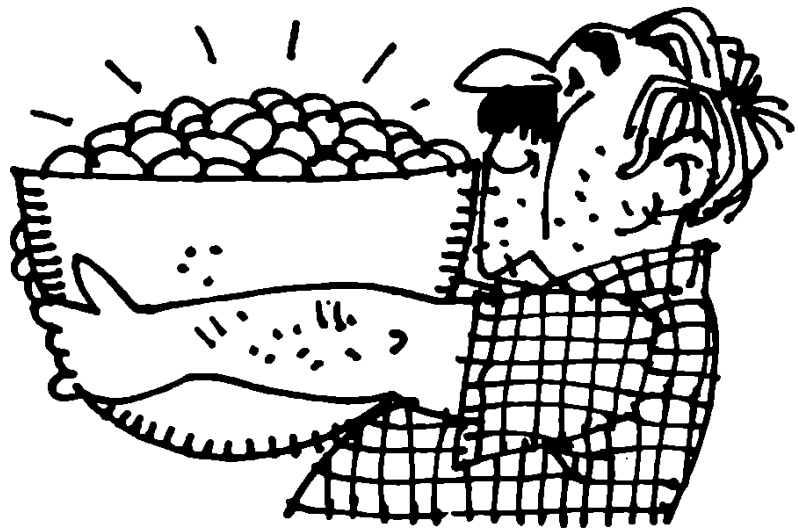

"অনেকদিন আগে একটা ধাঁধা দিয়েছিলুম. মনে আছে ?" ছোট্কা জানতে চাইল। একটু থেমে বলল, "সেই যে একটা হোটেলে গিয়ে তিন বন্ধু উঠেছিল, তারপর বিল মেটাতে প্রত্যেকে ১০ টাকা করে মোট ৩০ টাকা দিল বেয়ারার হাতে। বিল হয়েছিল ২৫ টাকার। বেয়ারা ৫ টাকা ফিরিয়ে আনল, বন্ধুরা সেই ৫ টাকা থেকে ২ টাকা বকশিস দিল তাকে। বাকি ৩ টাকা নিজেরা ভাগ করে নিল, মাথা-পিছু ১ টাকা হিসেবে। মনে পড়ছে ?"

আমার মনে পড়ল না। তাই বললাম, "তারপর ?"

"তারপর ?" ছোট্কা একটু হেসে বলল, "তারপর তারা তিন বন্ধু ভাবতে বসল, প্রত্যেকের ৯ টাকা করে খরচ হয়েছে, সুতরাং মোট ২৭ টাকা। বেয়ারাকে দিয়েছে ২ টাকা। ২৭ আর ২ যোগ করে হয় ২৯। তাহলে আর একটা টাকা কোথায় গেল ?"

"সত্যিই তো, কোথায় গেল ?" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

"কোথাও যায়নি।" ছোট্কা বলল, "এ-ভাবে হিসেব করাতেই গোলমাল। হোটেলের বিল ২৫ টাকা, বেয়ারা ২ টাকা আর ৩ টাকা ফেরত, এভাবে ভাবলে তিরিশ টাকার হিসেব ঠিকই মিলে যায়।" ছোটকা একটু থামল, "এ-ধাঁধাটা কিন্তু পুরনো। তোর কেন মনে নেই জানি না। যাই হোক, এবারে একটা নতুন ধাঁধা নে। এতেও ঠিকমতো হিসেব না জানলে ক্ষতি। এবং সত্যি সত্যি ক্ষতি।"

ছোট্কা ধাঁধাটা বলে গেল। আমি লিখে নিলাম।

প্রথম ধাঁধা ॥ একজনের কাছে মুরগির ডিম আছে ৩০টা। সে ঠিক করেছে টাকায় ৩টে করে মুরগির ডিম পাইকারি দরে বিক্রি করবে। তার কাছে হাঁসের ডিমও রয়েছে ৩০টা। তার বিক্রি-দর সে ঠিক করেছে, টাকায় দুটো।

এখন সে হাঁসের ডিম দুটো আর মুরগির ডিম তিনটে মিলিয়ে দু-টাকায় পাঁচটা করে ডিম বিক্রি করবে ? নাকি আলাদাভাবে বিক্রি করবে হাঁসের ডিম আর মুরগির ডিম ? সত্যি কোনো তফাত রয়েছে নাকি এই দুভাবে বিক্রি করার মধ্যে ? খুব ঠাণ্ডা মাথায়, হিসেব করে দ্যাখো তো।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ দু-ভাইয়ের বয়সের যোগফল ১২ বছর। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের থেকে ১০ বছরের বড়। কার কত বয়স ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

বোলতাবোআল

গতবারের উত্তর ॥ (১) এইভাবে গুণ সাজাতে থাকলে একটি রাশি নিশ্চিত হবে (x-x) অর্থাৎ শূন্য। পুরো গুণফলটাই তাই হবে শূন্য। (২) বিবদ(মান)সাঙ্ক। (৩) পরোপজীবী।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

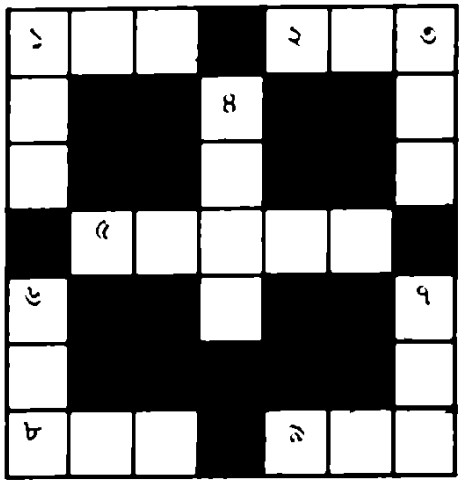

এবারের শব্দসন্ধানের নাম দিচ্ছি 'ফুলেল শব্দসন্ধান'। পাশাপাশি ও উপর-নীচ মিলিয়ে মোট দশটি ফুলের নাম বসিয়ে ছকের শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে। সংকেতে ফুলের নাম বেশির ভাগই সোজাসুজি, কোথাও একটু ঘুরিয়ে উল্লেখ করা হল। পাশাপাশি ও উপর-নীচে যথাস্থানে সঠিক হরফ বসিয়ে ফুলগুলো ফোটাবার দায়িত্ব তোমাদের। সংকেত—

অতসী চামেলি নীপ মল্লিকা
শিউলি করবী অপরাজিতা
গন্ধরাজ ও চাঁপার সুবাস
কোন্ ফুলবনে বন্দিনী সীতা ?

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

অ	হ	না	■	শু	শু	ক
র্ক	■	না	বি	ক	■	র
■	সো	■	দ্যা	■	■	ঙ্ক
■	ম	হা	সা	গ	র	■
গা	■	■	গ	■	ঙ্গ	■
লি	■	সা	র	দা	■	গ
ব	ল্ল	ম	■	গ	রু	ড়

মজার খেলা

৩৫টি দেশলাইকাঠি দিয়ে নীচের ছবির মতো একটা ছবি তৈরি করো টেবিলের উপরে—

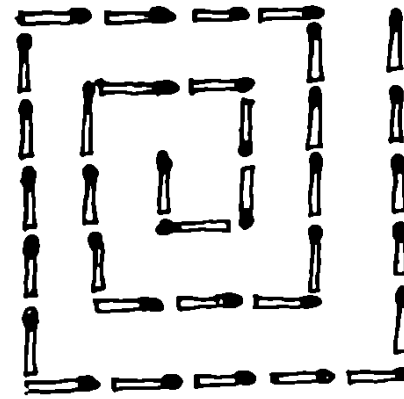

খেলাটা হল, এর থেকে এমনভাবে ৪টে কাঠি সরিয়ে এদিক-ওদিক বসাতে হবে, যাতে তিনটে বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়। সমান মাপের বর্গক্ষেত্র নয়, যে-কোনো মাপের।

অন্যান্য খেলার মতোই, এটাও নিজের চেষ্টায় করবার। তারপর বন্ধুদের দেওয়ার ব্যাপার। সুতরাং আগে নিজে চেষ্টা করো।

বন্ধুরা না পারলে, তোমাকেই করতে হবে। আর তুমিও যদি না পারো, সেই জন্যই নীচে একটা সমাধান শিখিয়ে দিচ্ছি। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে, কোন্ কাঠিগুলো সরেছে আর সরে কোথায় বসেছে।

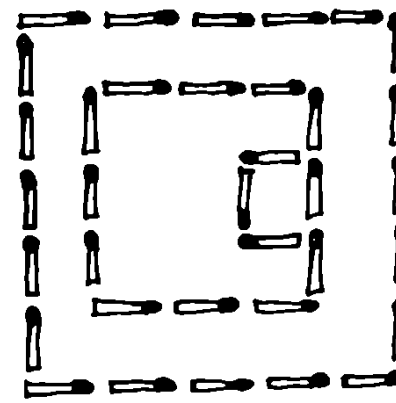

মজারু

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল বালতির ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর খটে

প্রঃ ছেলেকে মেডিকেলে ভরতি করাতে চাই। একটা সহজ উপায় বাতলে দিতে পারেন?

উঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের রাস্তায় ছেলেকে গাড়ি-চাপা পড়তে বলুন, চট করে ভরতি হয়ে যাবে।

প্রঃ সাহসিকতা বিষয়ে যে রচনা লিখতে বলেছিলাম, লিখে এনেছ?

উঃ এনেছি স্যার, কিন্তু আপনাকে দেখাতে সাহস পাচ্ছি না।

প্রঃ গল্পটা যেটুকু লিখেছি তা তো পড়লে, এটা জুতমতো শেষ করা যায় কেমন করে বলো তো?

উঃ একটা দেশলাই-কাঠি জ্বেলে।

সুসেন

হাসিখুশি

"সাধনবাবু তো খুব হিসেবি লোক দেখছি।"

"তা আর বলতে! জিনিসপত্র সম্বন্ধে এমন হিসেবি যে পাছে ঘড়ি চলে চলে ক্ষয়ে যায়, তাই রাত্রে ঘড়ি বন্ধ করে রাখেন।"

"কালকের অভিনয়ে তিন তিনটে মেডেল পেয়ে আনন্দ যে আর ধরে না দেখছি।"

"তুমি আর জ্বালিও না তো। পাঠালাম পাঁচটার দাম আর এল মাত্র তিনটে!"

এক ভদ্রলোক দুখানি লটারির টিকিট কিনেছিলেন। তার একটিতে পেয়ে গেলেন এক লাখ টাকা। বন্ধুরা অভিনন্দন জানাতে এসে দেখেন তিনি বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। বন্ধুরা কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি জবাব দিলেন, "দ্বিতীয় টিকিটটা কিনে যে আমার এক টাকা লোকসান হয়ে গেল!"

"শুনেছি তোমার বাবা একজন ধর্মযাজক। তো তুমি এত মিথ্যে কথা বল কেন?"

"তোমার বাবাও তো উকিল নন। তুমি এত জেরা কর কেন?"

ছবি দেবাশিস দেব

জানো কি তা?

সমর মিত্র

হাতে হাতে ফল
চোখে চোখে জল
পেটে পেটে ছল
পিছে পিছে চল।

মুখে মুখে বলা
পায়ে পায়ে দলা
কানে কানে মলা
চুপে চুপে শলা।

চুলে চুলে ফিতা
গলে গলে মিতা
বনে বনে চিতা-
বাঘ—জানো কি তা?

ছবি : অনুপ রায়

ভাগ্যগণনা

সুখেন্দু মজুমদার

বলতে তোমার ভাগ্যটা,
হাতের তালুর দাগ-কটা
দেখে নিয়ে গনৎকার
বলল হেসে, "চমৎকার
ভাগ্য তোমার বটে,
থাকত যদি ঘটে
একটা-কিছুর ডিগ্রি,
হতেই তোমার শিগগির
টাকা পয়সা ফল।
পারলে রত্তি দশ
গোমেদ ধারণ করো,
হিরের আংটি পরো,
মুক্তো চুনি প্রবাল
ফিরিয়ে দেবে কপাল।
নিদেন পক্ষে সিসে
পরলে পাবে দিশে।
দিয়ে দিলাম নিদান
করো এবার ফি-দান!"

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টৌরিবিনৃথ।
রেক্সোনা মেখে স্নান করুন—এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়।

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 B

এই শীতে

মণি শর্মা

আসছে পাকিস্তান। তাই এবার সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকেই দারুণ জমে যাবে ক্রিকেটের আসর। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে না উঠতে পারার জন্য তাদের মেজাজ অবশ্য বেশ খারাপ। ভারত দু-দুবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দিল! পাকিস্তান লয়েডের দলবলের মুখে হারের চুনকালি মাখাতে পারেনি বলে তাদের আক্ষেপের মাত্রা নিশ্চয়ই কম নয়। গতবারের পাকিস্তান সফরে ভারত খুব বিশ্রীভাবে হেরে গিয়েছিল। ব্যাটিংয়ে কেবল মহিন্দার অমরনাথই ধারাবাহিকভাবে সাফল্য লাভ করেছিলেন। আর, বোলিংয়ে পাকিস্তানকে নাজেহাল করার মতো ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

অন্যদিকে, জীবনের শ্রেষ্ঠ বোলিং করে পাক-অধিনায়ক ইমরান খান ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। আর রানের পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা। এমনকী ফিল্ডিংয়েও আমরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পারিনি। ফলে, ইমরানের ভীষণ বোলিংয়ের সঙ্গে আমাদের অন্যান্য ব্যর্থতাগুলো যুক্ত হওয়ায় আমাদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

এবার বোধহয় আমাদের হারিয়ে দেওয়া অত সহজ হবে না। এমনকী, ইমরান এলেও না। কারণ, ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের এখন আর কোনো অসুবিধে হবে না। পৃথিবীর দুর্দান্ত সব পেসারদের বিরুদ্ধে তাঁরা বুক চিতিয়ে খেলেছেন। এখন আর তাঁদের পা টলে না, হাত কাঁপে না।

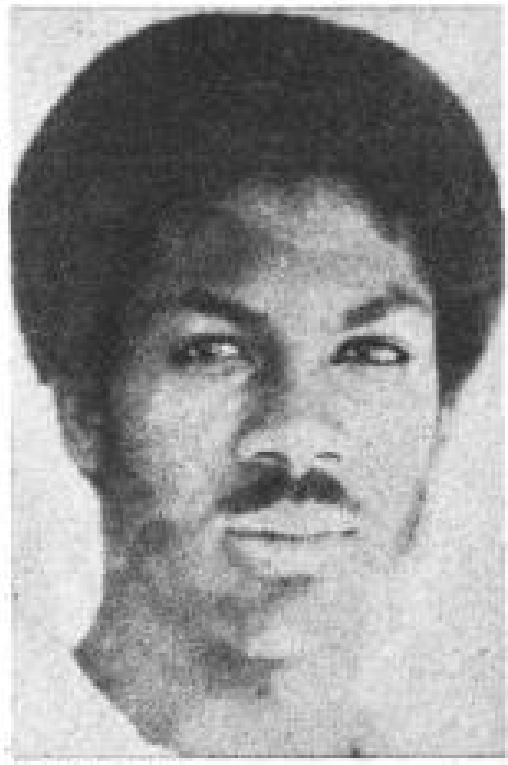

মাইকেল হোল্ডিং

সুতরাং পাকিস্তানি পেসারদের উল্লসিত হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই।

ইমরান আসবেন না। অতিরিক্ত ক্রিকেট খেলার ফলে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়বেন বলে ভারতে আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। নিন্দুকেরা অবশ্য অন্য কথা বলছে। তাদের কথা, এখানে এসে যদি ইমরান ভুরি-ভুরি উইকেট না পান, ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যানদের হাতে ঠ্যাঙানি খান, তবে তাঁর ইমেজে এক পোঁচ কালি পড়বে—এই ভয়ে খানসাহেব আসতে চাইছেন না। কথাটা হয়তো সর্বাংশে সত্য নয়, তবে ইমরান থাকলে দলের জোর যে অনেকখানি বেড়ে যেত এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইমরান ব্যাটেও যথেষ্ট পারদর্শী। তাছাড়া, অধিনায়কত্ব মন্দ করেন না। সুতরাং ইমরান না থাকায় দলের জোর খানিকটা কমে যাবে। বিভিন্ন অসুবিধের জন্য আসতে পারবেন না বলে কেউ-কেউ জানিয়েছেন।

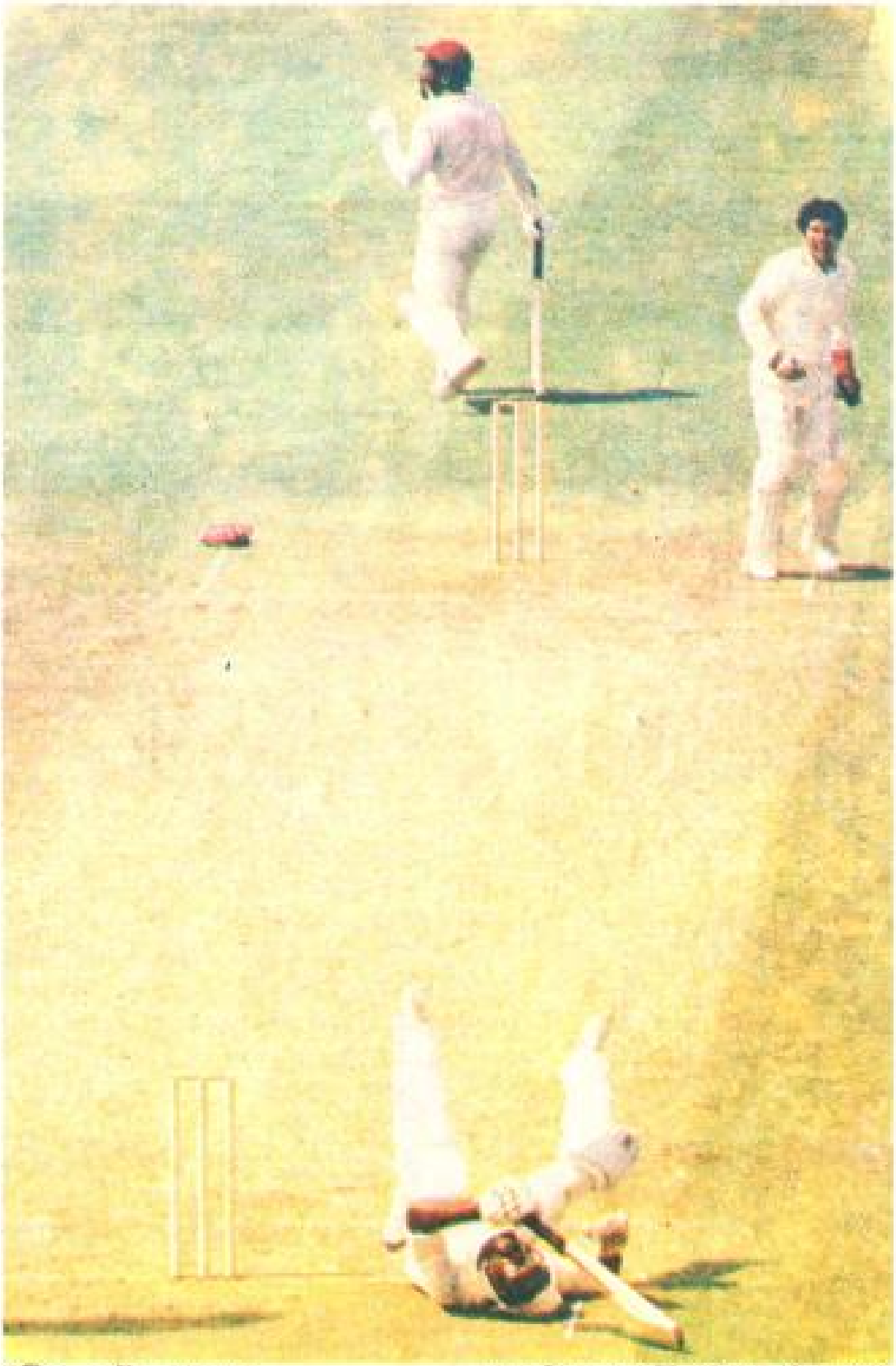

ইনিও ক্লাইভ লয়েড

জাহির আব্বাস

আবদুল কাদির

শেষ অবধি অবশ্য কে-কে আসবেন তা এখনই বলা যাচ্ছে না। শুধু এটুকু বলা যায়, খুব জোরদার একটা লড়াই হবে। কেননা, ভারতীয় দলের মনোবল এখন তুঙ্গে। টিম স্পিরিট অসাধারণ। গতবারের শোধ নেওয়ার জন্য ভারত ফুঁসছে। ওদিকে রাবার হাতে রেখে দেওয়ার জন্য শক্তিশালী পাকিস্তানও দারুণ লড়াই চালাবে।

অতএব তিন টেস্টের মরসুমটা মন্দ কাটবে না।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শীতের আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তুলতে এরপর আসছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা ফুরোতে না ফুরোতেই এসে যাবেন ক্রিকেটের কালোমানিকেরা। লয়েড বলেছেন, অধিনায়কত্ব করতে তাঁর আর একটুও ইচ্ছে নেই। অনেক হয়েছে। এবার তরুণরা এসে হাল ধরুক। আশা করা যাচ্ছে, উড়োজাহাজ থেকে প্রথমে হাসতে হাসতে নেমে আসবেন আইজ্যাক ভিভিয়ান আলেকজাণ্ডার রিচার্ডস। পেছনে তাঁর দলবল। রিচার্ডস ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্ববন্দিত। কিন্তু ক্যাপ্টেন হিসেবে কেমন হবেন—এ মরসুমে জানা যেতে পারে। ক্লাইভ লয়েড তাঁর মাথায় অধিনায়কত্বের মুকুট চড়িয়েছিলেন ভারতবর্ষের মাটিতে। রিচার্ডসও ভারত সফরেই প্রথম অধিনায়ক হয়ে আসবেন। নিতান্ত অসুস্থ হয়ে না পড়লে লয়েড আর একবার হয়তো ভারত-সফরে আসবেন। তবে এবারে কেবল বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চারজন দ্রুতগতির বোলারকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা দেশের মাটিতে কেমন করে মোকাবিলা করেন দেখার জন্য আমরা সবাই উন্মুখ হয়ে আছি। আর মন পড়ে রয়েছে রিচার্ডসের ব্যাটিংয়ে। দুনিয়ার সেরা ব্যাটসম্যান এখানে আমাদের চোখ জুড়িয়ে মন ভরিয়ে দিন—এটাই আমরা চাই। খুব বেশি ভাল খেললে অবশ্য আমাদের চিন্তায় পড়তে হবে। হোক, তবু শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের দুর্দান্ত ব্যাটিং দেখার লোভটাই আমাদের কাছে প্রশ্রয় পাবে। তাছাড়া, আমরাও তো কম নই। ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিংয়ে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব খোদ বিলেতের মাটিতে প্রমাণ করে এসেছি।

ছোট্ট এক বন্ধুর সঙ্গে সেদিন বাজি ধরেছি। উনত্রিশ নম্বর সেঞ্চুরিটা গাভাসকর কার বিরুদ্ধে করবেন—পাকিস্তান না ওয়েস্ট ইণ্ডিজ? বন্ধু বলেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই হয়ে যাবে। আমি বলেছি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে মেরেধরেই গাভাসকরের ওই সেঞ্চুরিটা আসবে। বাজি—এক বাক্স টফি আর চারটে চকোলেট। যে জিতবে সে পাবে।

তোমরা কেউ কিছু বলবে নাকি?

মহাকরণে আলোচনা চলছে, মাঠের নোংরামি কীভাবে বন্ধ করা যায়

খেলার নামে নোংরামি

মণীশ মৌলিক

অকল্পনীয় ! অবিশ্বাস্য ! তবু ঘটনাটা ঘটেছে। ১ অগস্ট সন্ধেবেলা রেডিও-টিভি শুনে অনেকেই চমকে উঠেছিলেন। এও কি হতে পারে ? হ্যাঁ, ১ অগস্ট ময়দানে কলকাতার চলতি ফুটবল লিগের কলঙ্ক সেই লজ্জাকর ঘটনাটা ঘটে গেছে।

খবরটা তোমরাও জানো নিশ্চয়ই। সেদিন কলকাতার ফুটবলকে মসীলিপ্ত করেছে তৃতীয় ডিভিসনের চারটি দল। টাউন মাঠে এক ভাঁড়ামোর প্রদর্শনীতে ইনডিয়ান বয়েজ অ্যাথলেটিক ক্লাব ১১৪—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ভিক্টোরিয়া ক্লাবকে। আর একটি তামাশায় তালতলা মাঠে ৮০—০ গোলে ইস্টারন্যাশনাল যুগশক্তিকে পরাজিত করে। সেদিন দু'দলেরই ছিল শেষ খেলা। এই খেলার পরই গোলপার্থক্যে যে যত সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে, তৃতীয় ডিভিসনে তার টিকে থাকবার কথা।

খেলাগুলো নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা, লিগে নামা-ওঠার প্রশ্নে যে-কোনো দলই মরিয়া হয়ে ওঠে। নীচে নেমে যেতে কোনো দলই চায় না। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই দলগুলো চেষ্টা করে। কিন্তু জেতার নামে সেদিন যে পঙ্কিল ঘটনা মাঠে ঘটেছে, তার চেয়ে চতুর্থ ডিভিসনে নেমে যাওয়াও বোধহয় অনেক সম্মানের বিষয় হত।

লিগের ছিয়াশি বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। আজ পর্যন্ত আর কোনো দল এত (১১৪) গোলে জিততে পারেনি। তাই কলকাতার লিগ ফুটবলে এটা একটা সর্বকালের রেকর্ড হয়ে রইল। গড়ের মাঠে লিগের সৎকার হয়েছে সেদিন, বলেছেন কেউ কেউ।

এই গড়াপেটা খেলার নোংরা চক্রান্তে কলকাতার ফুটবল অনেক আগেই জড়িয়ে পড়েছে। গট-আপ ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ময়দানে ফুটবলের আকর্ষণ ক্রমশ কমে আসছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফুটবল। অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে দর্শকদের ভাল খেলা দেখার সাধ। আই এফ এ বা সরকার যে সে-কথা জানেন না, এমন নয়। অথচ প্রথম থেকেই শক্ত হাতে এই গড়াপেটাকে দমন করার চেষ্টা করেননি। ফলে প্রশ্রয় পেতে পেতে গড়াপেটা একটু একটু করে বেড়ে উঠছিল। নোংরামির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ফুটবলকে।

১ অগস্টের প্রহসন সেই নোংরামির নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ। এখনই দৃঢ় মনোভাব নিয়ে গট-আপকে উচ্ছেদ করতে না পারলে সামনে লিগ-ফুটবলের বড় দুর্দিন !

গাবলু
সাবাশ! এবারে...
আমারটা দ্যাখো!
ধরো!

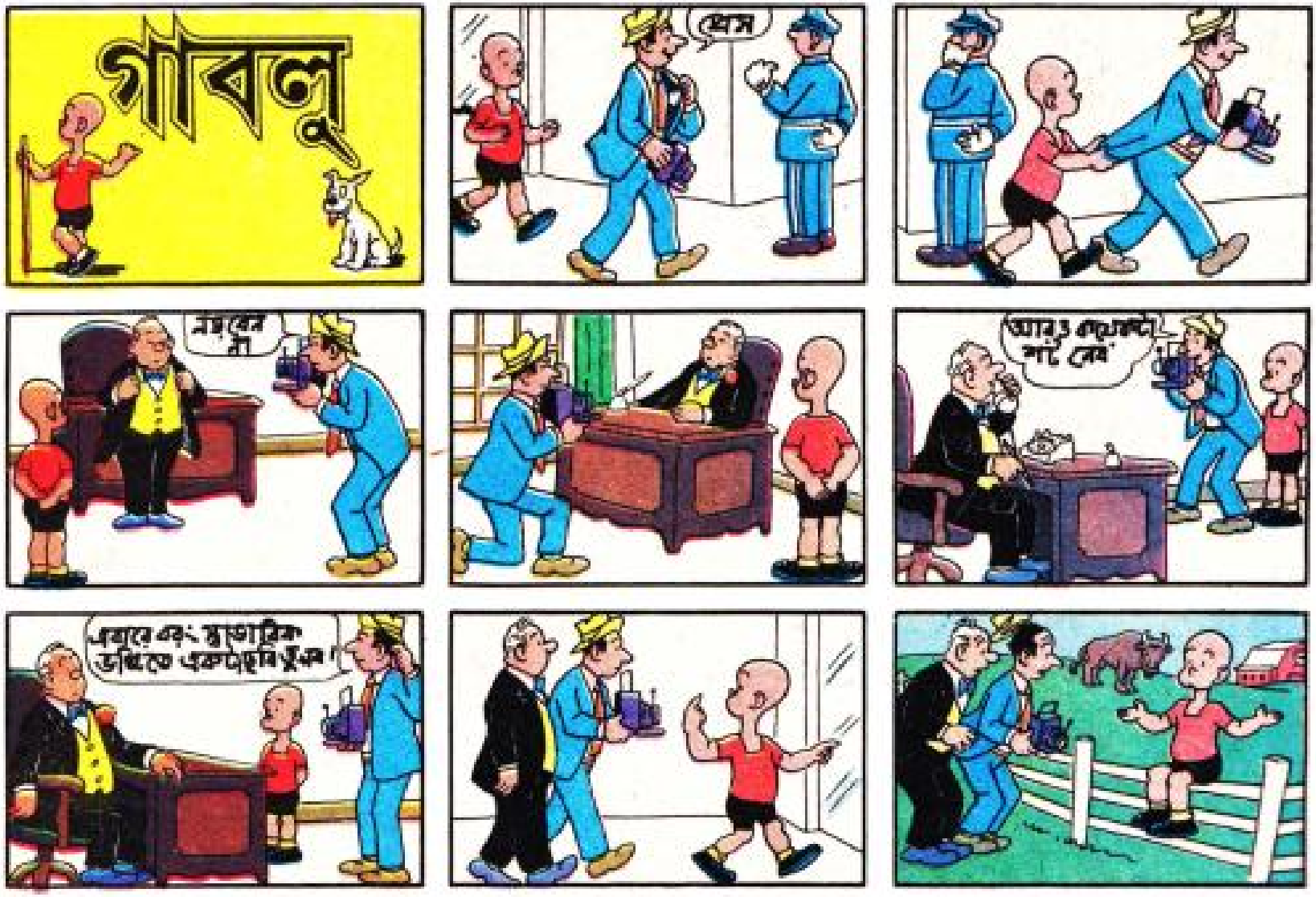

গাবলু
প্রেস
নড়বেন না
আরও কয়েকটা শট নেব
এবারে এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে একটা ছবি তুলব!

ফোকলা ফ-এর ফ্যাসাদ

বাচস্পতি

পরের ছুটির দিন জানলা দিয়ে হিগিনকাকুকে আসতে দেখেই ভণ্টু বোম্ ফাটানোর মতো আওয়াজ করে চেঁচিয়ে খ ছ ঠ থ ফ আর ঘ ঝ ঢ ধ ভ বলতে শুরু করে দিল। ঠামা আর মা রান্নাঘর থেকে চেঁচাতে লাগলেন, ঠামা—'গরে কি ডাকাইত পরসে, কান ত Zালাপালা অইয়া গেল,' আর মা—'কী হচ্ছে ভণ্টু, রে এ রকম চেঁচাবি তো—' বলে। ভণ্টু সবে ঠামাকে শুধরে দিয়েছে, "না ঠামা, 'গর' নয় 'ঘর', 'পরসে' নয়, 'পড়েছে', 'Zালাপালা' নয়, 'ঝালাপালা' —" এমন সময় হিগিনকাকুর প্রবেশ। ভণ্টুর মাস্টারি সবটাই তাঁর কানে গিয়েছিল, তার মাথাটা ধরে একটু আদর করে ঝাঁকিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "বৃদ্ধা আর বালিকা (অর্থাৎ ঠামা আর মা) দুজনেই ভুল করেছে। তবে দুজনের দু রকমের ভুল।" বলা বাহুল্য, 'ভুল'-এর 'ভ'-টাকেও বোম্ ফাটানোর মতো করেই ছাড়লেন তিনি— তাতে মুখের কাছে উড়তে থাকা একটা নীল মাছি ছিটকে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেল আর সম্ভবত

অনন্তধামে প্রয়াণ করল। ভণ্টু বলল, "বাঃ কাকু, ঠামার ভুলটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু মার কোথায় ভুল হল?"

"হয়েছে, হয়েছে!" বলে হিগিনকাকু ডান হাতটা বুদ্ধদেবের মতো করে তুলেই বললেন, "বউদি ফ বলতে গিয়ে ইংরিজি 'f'-এর আওয়াজ করেছে, অর্থাৎ কিনা ফোকলা-ফ ওটা, বাংলা ফ-এর বোম্-ফাটানো উচ্চারণ করেনি।"

বাবা ফটাস করে খবরের কাগজটা নামিয়ে বললেন, "দুয়ের তাাত?"

"তফাত হল, বাংলা 'ফ' স্পৃষ্ট বা বাধিত ব্যঞ্জন—দুটো ঠোঁট শক্ত হয়ে এঁটে যায়, তারপর ঐ বোম্-ফাটানো আওয়াজ করে ফ-র উচ্চারণ করে। এটা হল ভাল পটকার আওয়াজ। আর ইংরেজি f হল উষ্মব্যঞ্জন। তাতে নীচের ঠোঁট ওপরের দাঁতের পাটির সঙ্গে আল্‌তো এসে লাগে—তা দিয়ে ফুঁ-এর মতো বাতাস বেরুতে পারে। তার হল ভেজা পটকার আওয়াজ। এ-আওয়াজ বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণে চলবে না।"

"তাই নাকি? অনেকেই যে 'ফুল'কে fool বলে আর 'ফল'কে fall? তা বলবে না?"

"না রে দাদা, আর ত াতও নয়, তুমি যা বললে, হবে তফাত। বাংলায় ঐ উচ্চারণ।"

"াইন!" —বাবা এবার ঠিক ইংরেজি উচ্চারণ বলার সঙ্গে সঙ্গে টলমল করে তিনি এসে ঢুকল। হিগিনকাকু তার গাল টিপে দিয়ে বললেন, "ফুলের মতো এই মুখটাকে যে 'fool-এর মতো মুখ' বলবে তার 'ফিফ্‌টি' রুপিজ 'ফাইন' আর ছ মাস সাতাশ দিনের াঁসি।" ভণ্টু এবার ধরতে পারল যে, কাকু f-এর জায়গায় 'ফ' আর ফ-এর জায়গায় 'f' বসিয়ে ঠাট্টা করলেন।

(ক্রমশ)

চম্বলের পরীক্ষা

প্রসাদ

চম্বল ঘড়িতে দেখে নিল, পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা পড়তে তখনো আধ ঘণ্টা বাকি। দেখে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

He had almost finished.
He had only one more short note to write.
That would take him about ten minutes

তাহলে আজকের পরীক্ষাটা মোটের ওপর ভালই হল।

The paper did appear to be a little hard at first.
Mr Mandal had set the paper.
It was well-known that he liked to set a stiff paper.
He didn't like to set papers that the boys would find too easy.
But he also wanted to be sure that the questions were not too difficult.
"If you try you can always do better in your examinations," Mr Mandal often said to his pupils. "Those who don't even try have to fall behind the others."
Chambal didn't lose his nerve, didn't give up, and found questions that he could tackle.
By the time he was half way through the paper, he had already begun to feel quite happy.

যত সময় যাচ্ছে, লেখা যত এগোচ্ছে, চম্বলের আত্মবিশ্বাস তত বাড়ছে।

"I'm not doing so badly, after all," Chambal said to himself.
"I would rather answer a paper like this than one of the usual type," he thought. "It gives more satisfaction."

লেখা শেষ করে চম্বল একবার চার দিকে তাকিয়ে দেখে নিল, অন্যরা কী করছে।

Many of them were still writing.
A few had completed their papers.
One or two, it seemed, had also finished revision.
They were preparing to leave.
"I shall soon be with them." Chambal thought.
He had just finished when the bell went.

বিশেষভাবে লক্ষ করো নীচের শব্দগুলো এবারে বাক্যগুলিতে কোথায় কেমনভাবে বসেছে।

Almost, also, always, soon, even, already, rather, still, soon, just.

যেমন ধরো :

He had almost finished.
I shall soon be with them.
He had already begun to feel happy.
Many were still writing.

আবার দ্যাখো, নীচের দুটো বাক্যের মানে সম্পূর্ণ আলাদা :

He was still standing.
He was standing still.

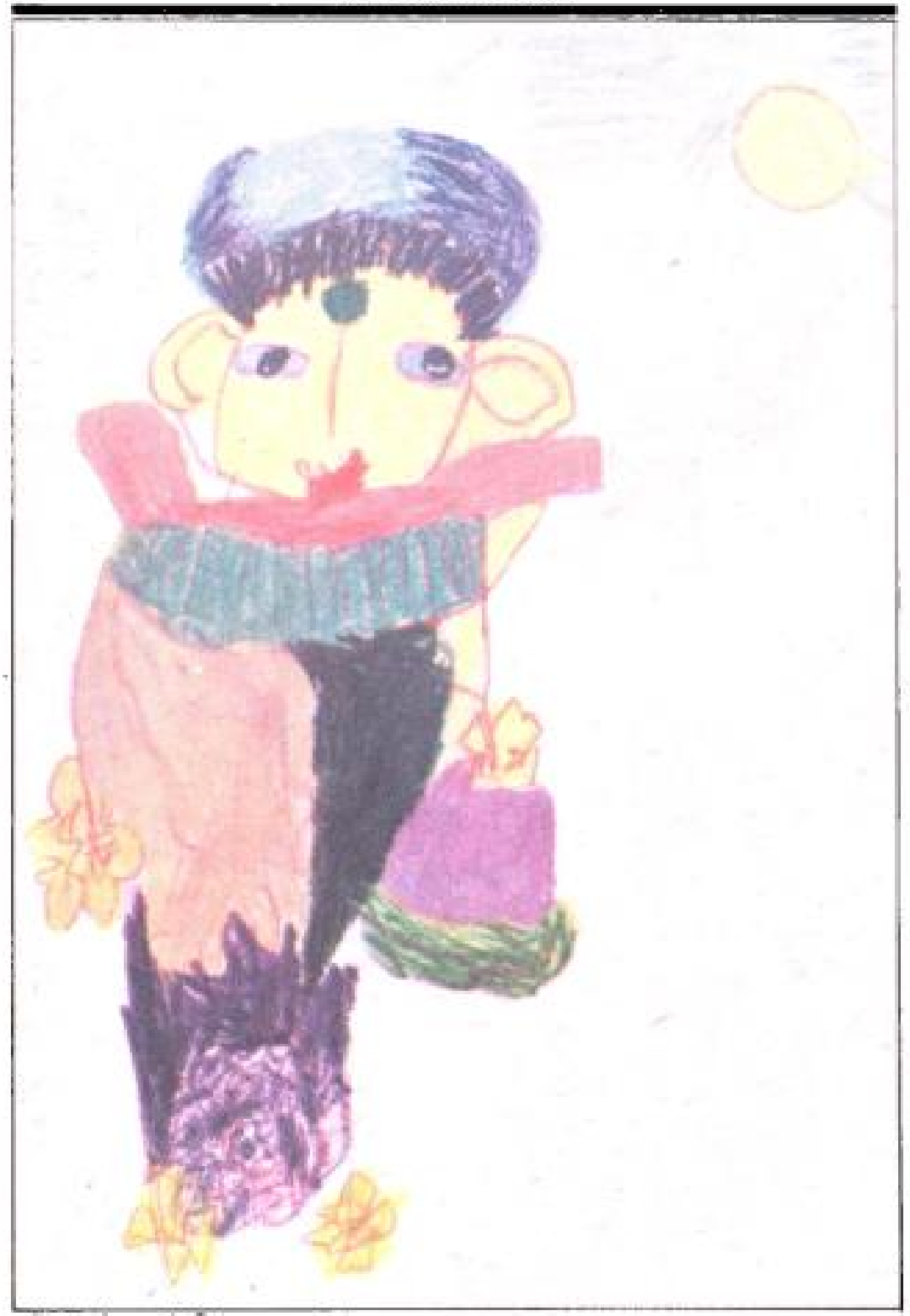

ছবি এঁকেছে সৌমিতা সাহা (বয়স ৪)

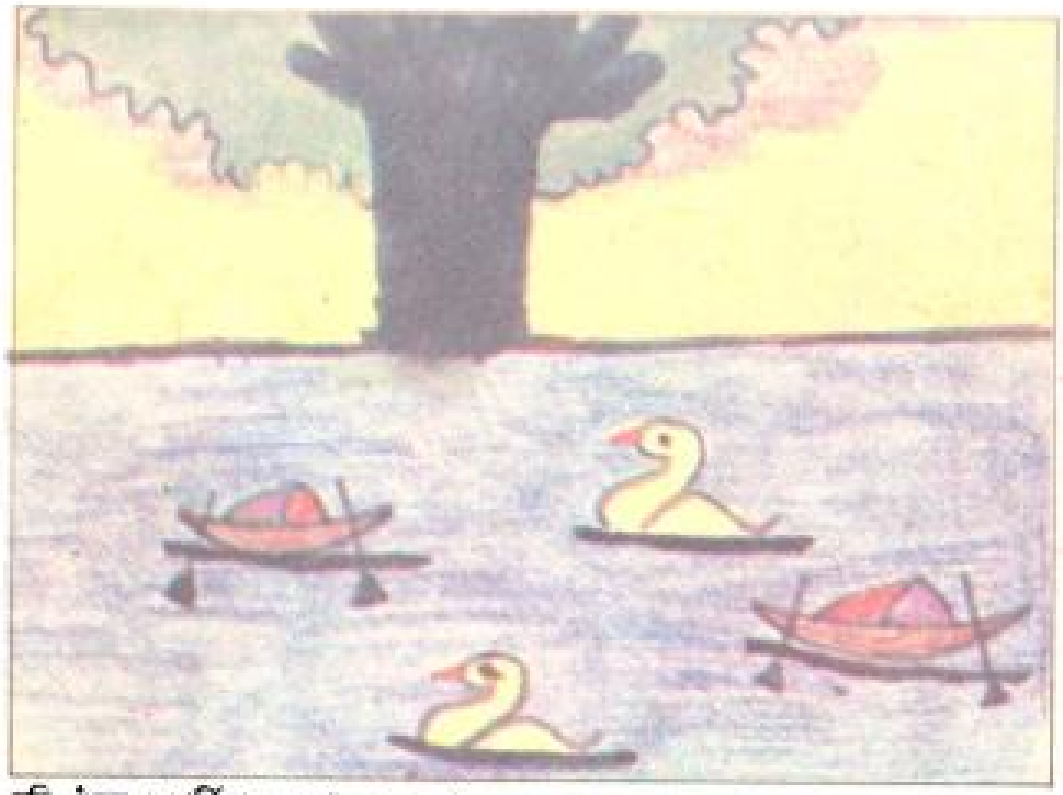

ছবি এঁকেছে শর্মিলা বসু (বয়স ১১)

ছবি এঁকেছে রিমঝিম থ্যাক্কার (বয়স ৭)

সূর্যমন্দির

পুরী যাবার পথে আমাদের বাস কোনারকে এসে থামল। এবার সূর্যমন্দির দেখব। বইয়ের পাতায় এতদিন যা দেখে এসেছি তাই এখন নিজের চোখে দেখতে পাব বলে মন আনন্দে নেচে উঠল।

বাস থেকে নেমেই মন্দির দেখতে গেলাম। বিরাট মন্দির! রথের আকারে তৈরি। বড় বড় ঘোড়া রথ টানছে। মন্দিরের গায়ে সুন্দর সব কারুকার্য। দেখলে অবাক হতে হয়।

আগে নাকি মন্দিরের কাছেই ছিল সমুদ্র। এখন অনেক দূরে সরে গেছে। মন্দির দেখে আমার খুব ভাল লাগল।

কৌশিক দে (বয়স ১৩)

ছাগল-ঘড়ি

আমি রোজ ছটার সময় বসন্তদাদার সঙ্গে স্কুলে যাই। সেই সময় আমাদের বাড়ির পাশে ছটা ছাগল দুধ দিতে আসে। তাদের গলায় ঘন্টি বাঁধা থাকে। আমি সেই ঘন্টার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারি, বসন্তদাদার আসার সময় হয়েছে। একদিন ছাগলগুলো তাড়াতাড়ি এল। কিন্তু আমি ভাবলাম, আমার বুঝি স্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। বসন্তদাদাই বোধহয় আসতে দেরি করছে।

আমার স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাবে। তাই বাবাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়া দিতে লাগলাম। কিন্তু বাবা বললেন, "এখনও ছটা বাজেনি। তোমার ছাগলরাই আজ তাড়াতাড়ি এসেছে। একটু পরেই তোমার বসন্তদাদা এসে পড়বে।"

সত্যিই তাই। একটু বাদে আমি মুখ বাড়াতেই দেখি, আমাকে ডাকবার জন্য বসন্তদাদা আসছে।

সৌরভ চৌধুরী (বয়স ৮)

ভোম্বল

গুপ্তিপাড়ার ভোম্বল
গায়ে দেয় কম্বল
খায় শুধু অম্বল
ডাকাতের গল্প
বলতেই বোঝে চম্বল

শরদিন্দু ঘোষ (বয়স ১০)

আড়ি

আমার প্রিয় বন্ধু পিয়ালি। পিয়ালির সঙ্গে আমার যত ভাব তত ঝগড়া। সেদিন সোমবার স্কুলে গিয়েছি। পিয়ালির পেন চুরি হয়েছে। ও বলল, আমার জন্য নাকি ওর পেন চুরি হয়েছে। ব্যস, ওর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি, তারপর ঝগড়া, তারপর আড়ি।

সেদিন আমাদের দুজনেরই মন খারাপ। আমি ভাবলাম, সপ্তাহের প্রথম দিনই ঝগড়া করলাম। তাই বাবাকে জিজ্ঞেসা করলাম, "এখন কী করব?"

বাবা বললেন, "দু-চার দিন অপেক্ষা কর, দেখবি ভাব হয়ে যাবে আবার।" কিন্তু, পিয়ালি আর স্কুলেই এল না। আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। বন্ধুরা বলল, ওর বাবা অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেছে। তাই ওরা চলে গেছে। আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আর পিয়ালির সঙ্গে দেখা হল না আমার।

উজ্জয়িনী বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৯)

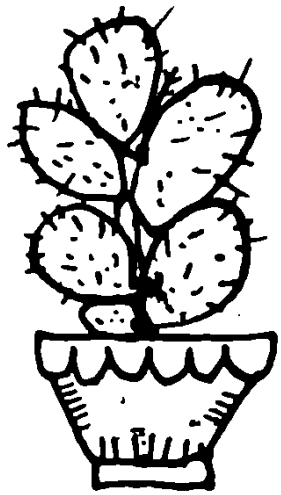

গাছের ওষুধ

আমরা রথের মেলা থেকে একটা ক্যাকটাস গাছ কিনে এনেছিলাম। সেটা একটু বড় হবার পরে আমার ছোট ভাই গাছের একটা পাতা ভেঙে দিয়েছিল। ভাঙা পাতা থেকে গলগল করে সাদা কষ বার হতে শুরু করল। তাই দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তখন আমি ভাবতে লাগলাম, কী করে গাছটার ভাঙা পাতাটা জোড়া দেওয়া যায়।

শেষে একটা উপায় বার করলাম। গাছটার ভাঙা জায়গাটায় আমি খানিকটা ভিজে মাটি লাগিয়ে দিলাম, আর সেই জায়গাটা একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেঁধে দিলাম।

কিছুদিন পরে সেই কাপড়টা খুলে দেখি, গাছের ভাঙা অংশটা ভালভাবে জোড়া লেগে গেছে। আরও কয়েকদিন বাদে দেখি, সেই ভাঙা পাতার ওপরে নতুন কচি পাতা গজাচ্ছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, গাছের উপযুক্ত ওষুধ মাটি। তাই আমার দেওয়া ওষুধে গাছটা আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৯)

ছবি এঁকেছে **শুভময় ভট্টাচার্য** (বয়স ১০)

বাঘা

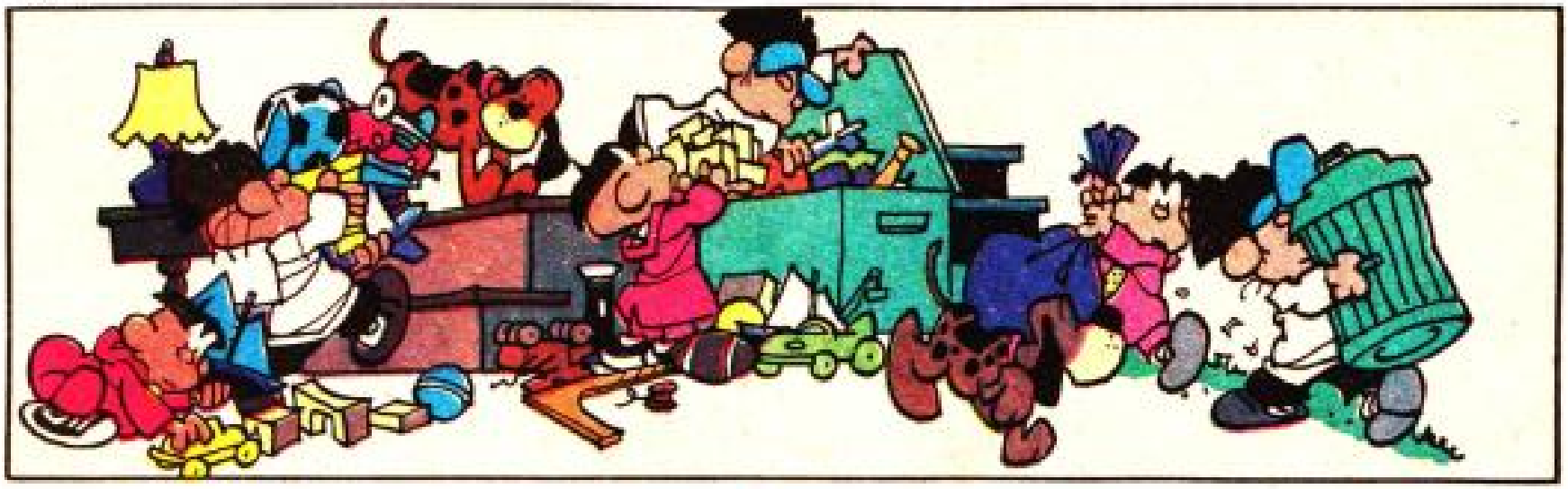

সব চেয়ে সুস্বাদু জলখাবার তৈরীর উন্নততর স্বাদিষ্ট পন্থা

নতুন!

MAGGI®

2-মিনিট নুডলস্

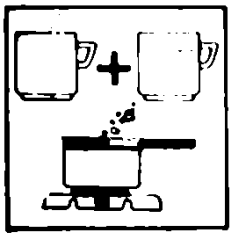

1 প্রায় দেড় কাপ জল ঢালুন এবং ফোটান

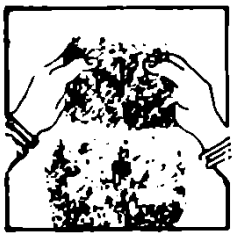

2 নুডলসকে চারটি ভাগে ভাগ ক'রে নিন

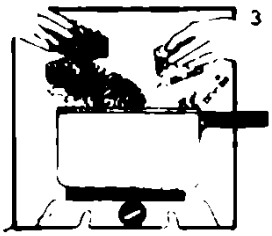

3 ফুটন্ত জলে নুডলস ফেলে দিন টেস্ট-মেকার সমেত

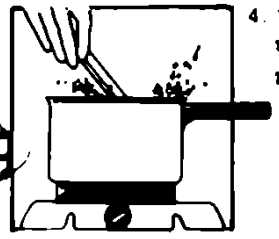

4. মাত্র মিনিট দুই ফুটতে দিন, মাঝে-মাঝে নাড়িয়ে দিন।

গরম পরিবেশন করুন স্বাদে অপূর্ব।

আপনি এই সহজ পদ্ধতিগুলি যখনই কাজে লাগাবেন তখনই কিন্তু ম্যাগি 2-মিনিট নুডলসের অপূর্ব স্বাদে আপনি রূপায়িত করবেন।

ম্যাগি—এর একান্ত নিজস্ব বিশেষ টেস্ট-মেকার রয়েছে, তিনটি চমৎকার স্বাদে— মসলা, চিকেন ও ক্যাপসিকা।
ম্যাগি—সর্বোচ্চ গুণমানের এবং ইতিপূর্বে বিরল সুস্বাদু রেও।

নীট ওজন 100 গ্রাম

কম সময়ে রান্না! খেতেও চমৎকার!

CLARION/111 BEN

জীবন ও হনু আলোচনা করছে

ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে

This represents 'warriors'.

জীবন বীমা আপনার ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত রাখার নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত উপায়। এ বিষয়ে বিশদ জেনে নিন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

1983 WORLD COMMUNICATIONS YEAR

daCunha/LIC/141/83 BN